স্বামী আত্মস্থানন্দ

সে প্রাক্‌স্বাধীন ভারতের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলন আর মহাযুদ্ধে উত্তাল দেশ আর বিশ্ব। সেই ধ্বংসমুখর বিক্ষুব্ধ কালের এলোমেলো বাতাসের মধ্যেই ভাগীরথীর পূত তীরে একখণ্ড জমির উপরে গড়ে উঠছে রামকৃষ্ণ মঠের বিস্ময়-জাগানিয়া সৌধখানি। কত পবিত্র মহাত্মার সাধনে তা তখনই এক তীর্থভূমি। সেখানেই আছেন তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দজী। তাঁকে দর্শন করার মানসে একদিন এক যুবক পৌঁছে গেল মঠে। পূজ্যপাদ অচলানন্দজী তখন থাকতেন বেলুড় মঠে বর্তমান লেগেট হাউসে। পূজনীয় মহারাজের খোঁজ নিয়ে যুবকটি পৌঁছাল লেগেট হাউসে। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কেবল দেখলো এক শীর্ণকায় সন্ন্যাসী শুধুমাত্র কৌপীন পরিধান করে ঘরের বারান্দায় হাঁটছেন। যুবকটি তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলো পূজনীয় অচলানন্দজী মহারাজের কথা। সন্ন্যাসী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। যুবকের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, এই সন্ন্যাসীই স্বামী অচলানন্দ – কেদার বাবা। প্রণাম হলো। পরিচয় হলো। হঠাৎই কেদারবাবা তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'অনেক জন্ম তো হল। এবার এ জন্মে স্বামীজীর কাজের জন্য জীবন দাও।' প্রবীণ সেই তাপস সন্ন্যাসীর আকস্মিক আর্তি হৃদয়ে প্রবেশ করল যুবকটির। চমকে উঠল সে। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি যে আগ্রহ ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠছিল, এই ডাক তাকেই যেন আরো উদ্দীপ্ত করে তুলল। আসন্ন ভাবীকালের আলোকিত পথ সে দেখতে পেল আজ স্পষ্ট করে। এই যুবকই পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ স্নগঘের পঞ্চদশ সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রী সত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। তাঁর জন্ম হয়েছিল আজকের বাংলাদেশের ঢাকার কাছে সাবাজপুরে – তাঁর মামার বাড়িতে। সেদিন ছিল বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্য তিথি। ১৯১৯-এর ২১-এ মে। বাবা ছিলেন বাংলাদেশের দিনাজপুরের রাজার সভাপণ্ডিত শ্রী রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তর্কতীর্থ। দিনাজপুর শহরের ক্ষেত্রীপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন তর্কতীর্থ মহাশয়। ভাগবত পণ্ডিত হিসেবে তখন তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। দিনাজপুর ও রাজশাহিতে তিনি সংস্কৃত পড়াতেন। দেশভাগের পর পড়িয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর গার্ল্‌স্ কলেজে। মা ননীবালা দেবীও ছিলেন খুব ধর্মপ্রাণা। এই পরিবারটিতে মিশেছিল বাংলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অনন্য দুটি ধারা। বাবা রামনারায়ণ ছিলেন চৈতন্যদেবের পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের বংশধর। আর মা ছিলেন শান্তিপুরের বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক অদ্বৈত আচার্যের বংশের মেয়ে, তথা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভাইঝি। এই পরিবারে নিত্য পূজিত হতেন নারায়ণ দধিবামনরূপে। এই পরিবার যে তাই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের সোনার সম্পদ তৈরী করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ! বস্তুত এই পরিবারের একাধিক

সন্তানই সংসার জীবনের প্রচলিত পথ ছেড়ে গ্রহণ করেছে ত্যাগের পথ। পূজনীয় মহারাজেরা ছিলেন সাত ভাই আর তিন বোন। মহারাজ ছিলেন সবার বড়। তাঁর পরের ভাই ছিলেন জ্যোতিকৃষ্ণ – যিনি পরে স্বামী যুক্তানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। আর এক ভাই মণীন্দ্রকৃষ্ণ আত্মসন্ন্যাস নিয়েছিলেন – নাম হয়েছিল স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দ। আর এক বোন সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী হয়েছিলেন – নাম হয়েছিল প্রব্রাজিকা অচ্যুতপ্রাণা (আরতিদি)। পারিবারিক এই পরিমণ্ডলে বড় হয়ে উঠতে উঠতে এঁদের মধ্যেও তাই স্বভাবতই গড়ে উঠেছিল সহজাত ধর্মবোধ। সত্যকৃষ্ণ মহারাজ নিজে পূজা-অর্চনা করতে খুব ভালবাসতেন। বড় হয়ে দুর্গাপূজাও করেছেন তিনি।

দিনাজপুরের জিলা হাইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সত্যকৃষ্ণ আসামের গৌহাটির কটন কলেজে আই. এ. পড়ার জন্যে আসেন। ইতিমধ্যেই তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা তাঁকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের দিকে টেনে নিয়ে আসে। গ্রীষ্মাবকাশের সময় যখন তিনি বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছেন, তখন তিনি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই অসুখ আরো নানা জটিলতা নিয়ে খুব প্রবল হয়ে ওঠে। এই সময়েই কোন একদিন তাঁর বাবা কাছের কোন একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে একটি বক্তৃতা দিতে যান। সেখানে সেদিন উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দিনাজপুর শাখাকেন্দ্রের স্বামী গদাধরানন্দজী মহারাজ। তাঁর সঙ্গে রামনারায়ণের আগে থেকেই কিছু পরিচয় ছিল। সেদিন গদাধরানন্দজী রামনারায়ণকে বিষণ্ণ দেখে তার সেই বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রামনারায়ণও সত্যকৃষ্ণের অসুস্থতার কথা তাঁকে জানান। সব শুনে গদাধরানন্দজী সত্যকৃষ্ণকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামনারায়ণও সানন্দে রাজী হয়ে যান। গদাধরানন্দজী উপস্থিত হন অসুস্থ সত্যকৃষ্ণের রোগশয্যাপার্শ্বে। পরবর্তীকালে পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী বলেছেন, ‘সেদিন আমি দেখলাম এক সন্ন্যাসী আমার মাথায় ও বুকে হাত বোলাচ্ছেন। খুব সুন্দর স্নেহ ও ভালোবাসায় ভরা এক কণ্ঠস্বরে তিনি কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে। তারপরেই আমরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে আমার অসুখ সেরে গেল।’ এই ঘটনা যেন সত্যকৃষ্ণের জীবনের গতিমুখ বদলে দিল – অনাগত কালের একটি নির্দিষ্ট পথের দিকে সকলের অজান্তে তাকে এগিয়ে দিয়ে গেল।

সুস্থ হয়ে উঠেই সত্যকৃষ্ণ জানতে চাইলেন বাবার কাছে এই সন্ন্যাসীর নাম ও পরিচয়। সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে তিনি একদিন তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সাথে উপস্থিত হলেন দিনাজপুর আশ্রমে গদাধরানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে। গদাধরানন্দজীও তাঁদের দেখে খুব খুশী হলেন এবং মন্দিরে নিয়ে গেলেন। প্রসাদ তুলে দিলেন তাদের হাতে। বললেন আবার আসতে। সত্যকৃষ্ণের যাতায়াত শুরু হল

দিনাজপুর আশ্রমে। এই সময়েই একদিন গদাধরানন্দজী সত্যকৃষ্ণের হাতে তুলে দিলেন স্বামীজীর 'ভারতে বিবেকানন্দ'। আশ্রমের মন্দিরে তাঁকে আরতি ও পূজা করার জন্যেও তিনি বলেন এই সময়েই। সত্যকৃষ্ণও তাঁর নির্দেশমত কখনো কখনো আশ্রমে পূজাদি করতেন। সকালবেলা মঙ্গলারতির পরে গদাধরানন্দজী কাঞ্চন নদীর তীর ধরে হাঁটতেন। মাঝে মাঝে সত্যকৃষ্ণকেও বলতেন তাঁর সঙ্গী হতে। এই প্রাতর্ভ্রমণের সময় একদিন তিনি হঠাৎ সত্যকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই হাঁটার সময় তুমি কী ভাবছ ? সবসময় ঈশ্বরের কথা চিন্তা করবে। সবসময় বলবে, ভগবান, তোমার নামই যেন আমার আশ্রয় হয়ে থাকে।' কখনো কখনো আবার এই পথচলার সময়ই নদীর তীরে কোন সুন্দর জায়গা দেখে বসে পড়তেন – ধ্যান করা শুরু করতেন। তাঁকে দেখে কিশোর সত্যকৃষ্ণও চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালে পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী বলেছেন, 'যদিও তাঁকে দেখে ধ্যান করা শুরু করেছিলাম, কিন্তু এরকম একটু করার পরেই বুঝতে পারছিলাম যে ভিতরে যেন কিছু একটা হচ্ছে।' মাঝে মাঝে গদাধরানন্দজীর আহবানে তিনি আশ্রমে রাত্রিবাসও করতেন। এইভাবেই এই পুণ্য মহাত্মার সংস্পর্শে এসে সত্যকৃষ্ণ তাঁর ভাবী জীবনের রসদ সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন।

কটন কলেজ থেকে পড়াশুনা শেষ করে প্রথমে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি অগলিভ হোস্টেলে থাকতেন। এই সময়েই তিনি দমদমের গৌরীপুরের রামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা স্টুডেন্টস হোমের কথা জানতে পারেন এবং সেখানেই থাকতে শুরু করেন। পররবর্তীকালে স্কটিশচার্চ কলেজ ছেড়ে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেখান থেকে অনার্স পাশ করে দর্শনশাস্ত্রে এম এ পড়ার জন্যে ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে তখন পড়াতেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ডঃ এন ব্রহ্ম, ডঃ পি বি দত্ত, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ পি বি শাস্ত্রী প্রমুখ প্রথিতযশা অধ্যাপকরা। তাঁদের সংস্পর্শে এসে পড়াশুনাতেও তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সত্যকৃষ্ণের জীবনদেবতা তাঁর জীবনতরীকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন অন্য খাতে বইয়ে দেবার জন্যে।

স্টুডেন্টস হোমে থাকার সময়েই তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে দর্শন করার মানসে পৌঁছান বেলুড় মঠে। তাঁর সেই দর্শনের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাঁর স্মৃতিচারণায়। মজা করে বলছেন সেখানে, 'চলে এলাম – খুব disappointed and frustrated হয়ে। ভাবলুম, এই নাকি শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য ! স্বামীজী যুবকদের কত আদর করতেন, কাছে টেনে নিতেন, আপন করে নিতেন, মাতিয়ে দিতেন। আর ইনি বেশ – একবার তাকালেনও না !

ভূতের মত বসে আছেন !' গৌরীপুর আশ্রমে ফিরে মনের সেই ভাবের কথা খোলাখুলি জানালেন নির্বেদানন্দজী মহারাজকে। অনাদি মহারাজ কিছু বললেন না, কেবল মুচ্‌কি হেসে থেমে গেলেন। যুবক সত্যকৃষ্ণ এও বললেন, 'মহাপুরুষ মহারাজ থাকলে কত আনন্দ হতো – তিনি কেমন মাতোয়ারা, এ একটুও ভাল লাগল না, এ কি মহাপুরুষ !'

তারপরেই ঘটেছিল ঘটনাটি, যা এই আধ্যাত্মিক জীবনপিপাসু যুবকের অন্তর্লোককে আলোড়িত করে দিয়ে গেল। তাঁর নিজের ভাষায়, 'তারপর সে রাত্রে প্রায় অবিরাম একটানা অত্যন্ত বাস্তবের মতন চললো একটা স্বপ্ন। স্বপ্ন স্বপ্নই, তবু মানুষের মনকে স্বপ্ন কখনো কখনো জাগ্রতের মতন জাগিয়ে দেয়। স্বপ্নের ব্যাঘ্র মিথ্যা। কিন্তু ব্যাঘ্রভীতিতে জাগরণ সত্য। আমারও তাই হলো। স্বপ্ন দেখলুম, পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজজীর পদ সম্বাহন করছি – মঠে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে। আর দেখছি মাঝে মাঝে তিনি বিজ্ঞানস্বামী হয়ে যাচ্ছেন। এই দেখছি যাঁর পদসেবা করছি তিনি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ - আবার দেখছি তিনি পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ। এইরকম alternately হতে লাগলো। দীর্ঘকাল স্বপ্নে ঐ সেবা করলুম, ঐ দৃশ্য দেখলুম ! ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখছি, আমি আনন্দে ভরপুর। আমার সকল দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেছে। স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হলো আমার – যিনিই মহাপুরুষ মহারাজ, তিনিই বিজ্ঞান মহারাজ। ব্যস্ত হয়ে গেলুম – গতকাল তো শ্রদ্ধা করি নি এঁকে ! এখন উপায় ?' নির্বেদানন্দজীকে সব জানাতে তিনি বললেন মঠে গিয়ে বিজ্ঞান মহারাজকেই এই ঘটনা বলতে। সেইদিনই কলেজ থেকে পালিয়ে পৌঁছালেন মঠে পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে ঢুকে দেখেন বিজ্ঞান মহারাজ অন্য পুরুষ – প্রসন্ন স্মিত – ডাকলেন তাঁকে। যুবক সত্যকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনের দিশা নির্দিষ্ট হয়ে গেল যাবতীয় সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে। রামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গার প্রত্যক্ষ পবিত্র স্পর্শ দূর ভাবীকালের জন্যে একটি মহৎ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলল পরম স্নেহে, প্রসন্ন আশীর্বাদে। ১৯৩৮ সালে পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেলেন তিনি। সব কিছুর শেষে একদিন নির্বেদানন্দজী আশীর্বাদ করে বলেছিলেন তাঁকে, 'একদিন তুমি দীক্ষা দেবে।' আত্মত্যাগী এই প্রবীণ সাধকের ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল – পরবর্তী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিকথাই তার প্রমাণ।

১৯৩৮-এর ১৪-ই জানুয়ারিতে বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের শুভ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক লগ্নে পূজ্যপাদ আত্মস্থানন্দজী উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তখনো তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন নি। পরবর্তীকালে সেই ঘটনা গভীর আবেগ ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করতেন তিনি। দেখেছিলেন কেমন করে পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ পুরানো মন্দির থেকে 'আত্মারামের কৌটা'

নামিয়ে এনে মাথায় নিয়ে আর চলতে পারছেন না – এতটাই ভাবে বিভোর তিনি। পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজীর মাথায় সেই পবিত্র আধারখানি রেখে তাঁকে ছুঁয়ে ধীরে ধীরে লাল কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে এসে নতুন মন্দিরে শ্রীশ্রী ঠাকুরকে বসালেন। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের পর যুবক সত্যকৃষ্ণ বিজ্ঞান মহারাজের ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করলেন তাঁকে, 'স্বামীজী তো আপনাকে বলেছিলেন উপর হতে দেখবেন। আপনি কি তা দেখেছিলেন ?' বিজ্ঞানানন্দজী উত্তর দিয়েছিলেন তাঁকে, 'হ্যাঁ দেখলুম। স্বামীজী, রাজা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, শশী মহারাজ – সকল গুরুভাইদের দেখলুম – হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন মন্দিরের মধ্যে।'

পূজনীয় অচলানন্দজীর অসামান্য প্রেরণার কথা তো আমরা আগেই শুনেছি। পূজনীয় কেদারবাবাকে যখন তিনি মাঝে মাঝে কথামৃত পড়ে শোনাতেন, তখন কেদারবাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আজ তুমি কত জপ করেছ ?' একবার মঠে সামান্য কিছু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। সেই নিয়ে তিনি যখন পূজ্যপাদ কেদারবাবাকে বলেন, কেদারবাবা তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কটা রসগোল্লা খেয়েছো ?' তিনি যখন জানালেন দুটি, তখন কেদারবাবা বলে উঠলেন, 'কি, দুটো রসগোল্লা খেয়েছো ? আর তুমি কিনা সাধু হতে চাও, স্বামীজীকে জীবনের আদর্শ করতে চাও ? দেখো যারা জীবনে খুব পবিত্র থাকতে চাইবে, তাদের রাতে খুব কম খেতে হবে আর মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে।' পরবর্তীকালে এই ঘটনার কথা স্মরণ করে পূজ্যপাদ আত্মস্থানন্দজী মন্তব্য করেছিলেন, 'He was a terrific inspiration.'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দিনাজপুরে বাল্যকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক সন্ন্যাসী পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর দর্শন পান। বালকস্বভাব পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে বালক সত্যকৃষ্ণ মার্বেল খেলেছিলেন। পরবর্তীকালে কলেজে পড়ার সময় তিনি কলকাতা বেদান্ত মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক সন্ন্যাসী পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দজীর দর্শনও লাভ করেন। এছাড়াও তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের তখনকার বেশ কয়েকজন প্রবীণ সাধুর পবিত্র সান্নিধ্যে আসার সুযোগও পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য, শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজী প্রমুখ। এইসব উচ্চকোটির জীবনের সংস্পর্শেই যুবক সত্যকৃষ্ণের জীবনগতি আরো সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। ভিতরে নিত্য ধ্বনিত হতে থাকে পূজ্যপাদ অচলানন্দজীর সেই আহ্বান – স্বামীজীর জন্যে এই জন্ম উৎসর্গ করার ডাক।

ইতিমধ্যে তিনি নিজেই গৌরীপুরের স্টুডেন্টস হোমের অনুসরণে দুঃস্থ ছাত্রদের জন্যে বিনামূল্যের একটি ছাত্রাবাস শুরু করেন কলকাতায় সূর্য সেন স্ট্রীটে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে একটি স্থানে। কিন্তু মনের মধ্যে তখন অন্য সুর বেজে চলেছে নিয়ত। একদিকে কেদারবাবা বলছেন এম এ পড়ার আর

দরকার নেই, মঠে যোগ দিলেই হয়। অপরদিকে মাধবানন্দজী বলছেন এম এ পাশ করে তারপর আসতে। একদিন হঠাৎ রাতে স্বপ্ন দেখেন কেদারবাবা একটা চাবুক হাতে তাঁকে খুব মারছেন আর বলছেন, 'সাধু হওয়ার কথা কেবল মুখে বলিস, এদিকে এম এ পড়া ছেড়ে আসতে পারছিস না !' ঘুম ভেঙে দেখলেন গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা। ঠিক করে ফেললেন নিজের জীবনের ভবিতব্যকে। কাউকে কিছু না জানিয়ে, কেবল ছাত্রাবাসের একজন বিশ্বস্ত সহযোগীকে সব কাজের ভার ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর গিয়ে পৌঁছালেন স্বামী মাধবানন্দজীর কাছে। মনের শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাঁর কাছে। মাধবানন্দজী তাঁকে আগে থেকেই চিনতেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতিও মাধবানন্দজীর গোচরে ছিল। শুনলেন যে, এম এ পড়া শেষ হয় নি তখন সত্যকৃষ্ণের। তাই আপত্তি জানিয়ে আবার বললেন, পড়াশুনা শেষ করে আসতে। কিন্তু বৈরাগ্যের প্রবল প্রেরণায় ঘর-ছাড়া যুবক আর ঘরে ফিরতে নারাজ। মাধবানন্দজীর পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে জানালেন সব ঘটনাবলীর কথা, আর্তি জানালেন, 'মহারাজ কৃপা করে গ্রহণ করুন।' চমৎকৃত মাধবানন্দজী রাজী হলেন। পরবর্তীকালে একদিন মাধবানন্দজী এই যুবককেই আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'তুমি একসময় এই সংঘের অনেক বড় কাজ করবে।' সংঘের প্রবীণ এক সাধু মন্তব্য করেছেন যে একথা নিশ্চিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মাধবানন্দজী এই উক্তির মধ্য দিয়ে এই সঙ্ঘের আগামী দিনের এক সঙ্ঘধ্যক্ষের কথাই নির্দেশ করে দিয়েছিলেন – উত্তরকালের ইতিহাস সে কথার সত্য সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর তিথিপূজার দিনে ১৯৪১-এর ৩ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করলেন সত্যকৃষ্ণ। তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। এর আগেই বাবার কাছে অনুমতি নিতে গিয়েছিলেন। ধর্মপ্রাণ শাস্ত্রজ্ঞ পিতার স্পষ্ট জবাব ছিল, 'ছেলে সাধু হতে চাইলে কেন বাধা দেব ?' তাঁর সঙ্গেই একসাথে সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন শ্রীকান্ত নামের এক যুবক। মঠের তখনকার প্রথা অনুযায়ী দুজনকেই থাকতে হয়েছিল মঠে ভিজিটর্‌স্ রুমে। শ্রীকান্ত পরবর্তীকালে পরিচিত হন স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ নামে। একসঙ্গে সংঘে যোগদান করার জন্যে দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল আজীবন।

সঙ্ঘে যোগদানের পর তাঁকে প্রথমে পাঠানো হয় দেওঘর বিদ্যাপীঠে। সেখানে তখন ছিলেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী মহারাজ। তাঁর অধীনে কিছুকাল বিদ্যাপীঠের কাজ করার পরই বেলুড় মঠ থেকে নির্দেশ আসে মায়াবতীতে যাওয়ার। তখন সেখানে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। ব্রহ্মচারী সত্যকৃষ্ণ তাঁর অধীনে সহকারী সম্পাদকের কাজ শুরু করেন। কখনো কখনো পূজনীয় গম্ভীরানন্দজীর কোন লেখায় ইংরাজী ভাষা হয়ত তাঁর মনে হয়েছে একটু পরিবর্তনের দরকার। যখনই গম্ভীরানন্দজীকে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তখনই

অনুমতি পেয়েছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও লিখনশৈলীর উপর এমনই আস্থা ছিল স্বয়ং গম্ভীরানন্দজীরও। এই সময় তিনি কয়েকটি প্রবন্ধও রচনা করেন। তাঁর করা কয়েকটি গ্রন্থ সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল এই পর্বে। তখন সেখানে মোহনজী নামে একজন ছিলেন, তাঁর কাছে যত্ন করে শিখেছিলেন হিন্দী ভাষা। সেই সময় মায়াবতীর নিয়ম ছিল যে, আশ্রমবাসী সাধু-ব্রহ্মচারীরা কেউ-না-কেউ মাঝেমাঝে কিছু রান্না করবেন। পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী ঠিক করলেন যে তিনি একদিন সকলকে রসগোল্লা তৈরী করে খাওয়াবেন। সব স্থির করে জোগার-যন্ত্র করে রসগোল্লা তৈরীও শুরু করলেন। কিন্তু একটা সময়ে এসে দেখা গেল যে, রসগোল্লাগুলি ঠিক মত হচ্ছে না, ছানা রস সব আলাদা আলাদা থেকে যাচ্ছে। তাই ভাবলেন যে, এগুলি আর সাধুদের খাওয়ানো যাবে না। কিন্তু খাওয়ার সময় গম্ভীরানন্দজী সব শুনে বললেন যে, তা কেন, ওইগুলিই খাওয়া যেতে পারে। সকলে আনন্দ করে তাই গ্রহণ করলেন।

ইতিমধ্যেই আবার কাজ ও স্থান পরিবর্তনের আহ্বান এলো। সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ তাঁকে সেবক হিসেবে চেয়ে পাঠালেন। প্রথমে মাধবানন্দজী তাঁকে মায়াবতী থেকে পাঠাতে চাইছিলেন না। কিন্তু পূজনীয় বিরজানন্দজীর ইচ্ছাকে শেষ পর্যন্ত মর্যাদা দিয়েই ব্রহ্মচারী সত্যকৃষ্ণকে পাঠানো হল সেবক করে। ১৯৪৫-এ পূজনীয় স্বামী বিরজানন্দজীর কাছ থেকেই তিনি ব্রহ্মচর্য পান। নতুন নাম হয় শান্তিচৈতন্য। ১৯৪৯-এ পূজনীয় মহারাজের কাছ থেকে পান সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা। এবার তাঁর নাম হল স্বামী আত্মস্থানন্দ। পূজনীয় বিরজানন্দ মহারাজের কাছেই হিমালয়ের শান্তিস্নাত কোলে শ্যামলাতালের আশ্রমে তিনি কাটিয়েছেন দীর্ঘ সময়। বিরজানন্দজীর পাশের ঘরেই থাকতেন তিনি। বিরজানন্দজীর দৈনন্দিন কর্মধারার নানান খুঁটিনাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার অসামান্য দক্ষতা ছিল তাঁর। অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের মানুষ ছিলেন সত্যকৃষ্ণ মহারাজ। পূজনীয় বিরজানন্দজীর প্রয়োজন বুঝে ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি জোগাড় করে রাখতেন। ফলত বিরজানন্দজীও তাঁর উপর নির্ভর করতেন খুব। পরের দিকে পূজনীয় বিরজানন্দজীর অনেক চিঠিপত্র লেখার ভারও তাঁর উপরেই পড়েছিল। অথচ, শিশুর মত স্বভাবের পূজ্যপাদ বিরজানন্দজীর সাথে মিশতেও পারতেন অত্যন্ত সহজ আন্তরিকতায়। একবার শ্যামলাতালে পূজনীয় বিরজানন্দজী মহারাজ ঠিক করেছেন যে সবাইকে সিঙাড়া খাওয়াবেন। সেইমত নিজেই সব আয়োজন করে তৈরী করেছেন সিঙাড়া। পূজনীয় বিরজানন্দজী একটি একটি করে পাঠাচ্ছেন সাধুদেরকে। কিন্তু কারোরই সিঙাড়াটি পছন্দ হচ্ছে না। অথচ কেউ কিছু বলতে পারছেনও না। বিরজানন্দজী সেবক সত্যকৃষ্ণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সাধুরা খেয়ে কেমন বলছে। সত্যকৃষ্ণ অকপটে জানালেন, যে সাধুরা বলছে, ‘এসব পচা।’ শুনে প্রথমে বিরজানন্দজী কিছু বললেন না। একটু পরে সিঙাড়া আবার ভাল করে

লঙ্কা-পেঁয়াজ ইত্যাদি দিয়ে তৈরী করে পাঠালেন। এবার সবারই মুখে বেশ ভাল লাগল। সেবক সত্যকৃষ্ণেরই উপর ভার পড়ল সে খবর বিরজানন্দজীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার। তিনি তা নিবেদনও করলেন। শুনেই বিরজানন্দজী সেবককে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হুঁ, বলে কিনা পচা।' এমনই ছিল তাঁদের মধুর সম্পর্ক।

একবার শ্যামলাতালে থাকাকালে পূজনীয় বিরজানন্দজীর হার্টের সমস্যাটি খুব বেড়ে গিয়েছে। সেই সময় শ্যামলাতালের কাছাকাছি কোন ডাক্তার থাকতেন না। ডাক্তার দেখাতে হলে যেতে হত মায়াবতীর কাছে। অথচ বিরজানন্দজীর পক্ষে তখন যাওয়া সম্ভব নয়। অকুতোভয় সেবক সত্যকৃষ্ণই এগিয়ে এলেন সমস্যা সমাধানের জন্যে। সেকালে পথেও নানারকম প্রাণঘাতী উপদ্রবের আশংকা ছিল। কোন কিছুর অপেক্ষা না করেই একজন মাত্র বন্দুকধারীকে নিয়ে তিনি হাঁটা লাগালেন ডাক্তারের খোঁজে মায়াবতীর উদ্দেশ্যে। পুরো রাস্তা হেঁটে গেলেন। পরে ডাক্তারকে নিয়ে ফিরলেন মহারাজের চিকিৎসার জন্যে। পরবর্তীকালে পূজনীয় বিরজানন্দজী মহারাজের স্নেহ-সাহচর্যের কথা, তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যের কথা পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন তিনি। বিরজানন্দজীর ধ্যান-তপস্যাপরায়ণ জীবন যেমন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, তেমনই কাজের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও পূজার ভাবটিও তাঁকে খুব চমৎকৃত করত। সন্ন্যাসের পর মহারাজের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে তিনি মাসাধিককাল সাধন-ভজন করেছিলেন। ১৯৫১ সালে পূজ্যপাদ বিরজানন্দজীর মহাসমাধি লাভ ঘটে। এরপর পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী মহারাজ দেরাদুন আশ্রমে তপস্যা করেছিলেন। সেই সময় সেখানে ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দজী মহারাজ। সুযোগ পেয়ে আত্মস্থানন্দজী জগদানন্দজীর কাছে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন এই পর্বেই। পরবর্তীকালে পূজনীয় জগদানন্দজীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, জগদানন্দজী ছিলেন বেদান্তের মূল ভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর মহাপ্রয়াণের সময় পূজ্যপাদ আত্মস্থানন্দজী তাঁর কাছেই ছিলেন। সেই অপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনাও করেছেন পূজনীয় মহারাজ পরবর্তীকালে গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধায়। যখন ডাক্তাররা সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন জীবনের, যখন তাঁর পা দুটি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তখন পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী তাঁর পা ম্যাসেজ করে গরম রাখবার চেষ্টা করছেন। এই দেখে জগদানন্দজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কী করছেন ? পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী বলেন যে তিনি 'একটু ম্যাসেজ' করার চেষ্টা করছেন। শুনে পূজ্যপাদ জগদানন্দজী তাঁকে বলেন, 'কি ম্যাসেজ করছ ? আরে - সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' এই ঘটনা আত্মস্থানন্দজীর জীবনে গভীর রেখাপাত করে।

দেরাদুনে তপস্যাপর্ব চলার সময়েই আবার ডাক এল স্বামীজীর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার। বেলুড় মঠের নির্দেশে এবার তাঁকে যেতে হলো রাঁচিতে অবস্থিত টিবি স্যানেটোরিয়ামে সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে। সেখানে তখন সম্পাদক ছিলেন স্বামী বেদান্তানন্দজী মহারাজ। তাঁর উদ্যোগে রাঁচির এই স্যানেটোরিয়ামটির (হাসপাতাল) প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁরই উদ্যোগে এখানে তৈরী হয় অপারেশান থিয়েটার, প্যাথোলজি বিভাগ, সাধুদের জন্যে আলাদা ওয়ার্ড, সাধারণ ওয়ার্ড ও কটেজ ইত্যাদি। সব কিছুর জন্যেই এই পর্বে তাঁকে প্রবল পরিশ্রম করতে হয়। অপারেশান থিয়েটার তৈরীর জন্যে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশদের ফেলে যাওয়া অনেক জিনিসপত্র এই সময় তিনি জোগাড় করেছিলেন। কলকাতা থেকে ডঃ এ কে পালকে নিয়ে গিয়ে অপারেশান করাতেন। ঐ অঞ্চলে জলের অভাব দেখে দূরদর্শী পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী এর একটি স্থায়ী সমাধানের কথা ভাবতে শুরু করেন। মাধবন নামক এক প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁকে তিনি নিয়ে যান রাঁচীতে। তাঁরই সঙ্গে আলোচনা করে সেখানে তৈরী করেন একটি জলাধার। সেখানকার জলের সমস্যার সমাধানের জন্যে তাঁর এই পরিকল্পনা অবশ্যই সমকালের প্রেক্ষিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজী যখন অসুস্থ হয়ে রাঁচি টিবি স্যানিটোরিয়ামে আসেন, তখন মহারাজ তাঁর জন্যে একটি ছোট কটেজ তৈরী করে দেন। অনেক পরে যখন তিনি টিবি স্যনেটোরিয়ামে পদার্পণ করেছিলেন সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে, তখন এই কুটিরটির ভগ্নদশা দেখে আবার তাকে সংস্কার করার জন্যে কিছু অর্থের ব্যবস্থা করেন। পুনর্নির্মিত সেই কুটিরটি আজও 'শান্তানন্দ কুঠিয়া' নামে সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিভৃত সাধন-ভজনের স্থল হয়ে রয়েছে।

১৯৫৮-তে তাঁকে আবার ডেকে পাঠানো হয় বৃহত্তর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কাজ করার জন্যে। বার্মায় রেঙ্গুনে তখন রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র ছিল এবং সেখানে একটি হাসপাতালও ছিল। এই রেঙ্গুন কেন্দ্রের সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েই তাঁকে এবার পাঠানো হল। সেটা ১৯৫৮ সাল। সেখানে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হাসপাতালটির উন্নতির জন্যে মনোনিবেশ করলেন। প্রবল পরিশ্রম করে হাসপাতালের সব কটি বিভাগের তিনি সম্প্রসারণ তথা উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে এটি হয়ে উঠেছিল বার্মার সেরা হাসপাতাল। এখানে তাঁরই সাহসে ও উদ্যোগে সেই যুগে হার্ট সার্জারির ব্যবস্থা হয়েছিল। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের একটি চমৎকার মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। তদানীন্তন বার্মার প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য অনেক উচ্চ পদাধিকারীরা তাঁকে খুব ভালভাবেই চিনতেন। আবার সমাজের অত্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তাঁর একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নিজে বার্মিজ ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। সেই ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন। ফলত

বার্মার সাধারণ মানুষ তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখত। রেঙ্গুনে তিনি পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী দয়ানন্দজীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পূজনীয় স্বামী যতীশ্বরানন্দজীকে নিয়ে গিয়ে তিনি সেখানে দীক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। বার্মার বর্তমান নেত্রী সু চি তখন ছিলেন অল্প বয়সের এক বালিকা। তিনিও সেই সময় মহারাজের কাছে আসতেন এবং মহারাজের কাছ থেকে লজেন্স নিয়ে যেতেন। সমস্ত শ্রেণির বার্মিজদের ভালোবাসা তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন। বার্মিজরা যখন সুস্থ হয়ে ফিরে যেত, তখন অনেক সময় তাঁরা আশ্রমের উন্নতির জন্যে সোনা দিয়ে যেত। রেঙ্গুনে তাঁর অসামান্য সেবাকাজের এই পর্বটি অবশ্য খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। বার্মায় সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর সেখানে অন্য ধর্মাবলম্বীদের যাবতীয় কাজকর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশনকেও তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। মহারাজ স্বামীজীর মূর্তিটিকে স্থানান্তরিত করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং সেটিকে ভারতে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে সেটি মাইশোর বিদ্যাশালা প্রাঙ্গণে পুনঃস্থাপিত হয়। মহারাজ সবাইকে নিয়ে স্টিমারযোগে ফিরে আসেন ভারতে।

এরপর কিছুদিন তিনি ভারতের নানা তীর্থ দর্শন করতে থাকেন। সনাতন আধ্যাত্মিক ভারতের মর্মস্থল এই তীর্থস্থানগুলি সেদিন এই অক্লান্ত কর্মযোগী সন্ন্যাসীর জীবনের সর্বাধিক আপন সম্পদ হয়ে উঠেছিল। এর অল্পদিন পরেই আবার তাঁর কাছে এসে পৌঁছায় স্বামীজীর কর্মযোগে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পুনরাহ্বান। ১৯৬৬ সালে তাঁকে গুজরাটের রাজকোট আশ্রমের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর আগে এখানে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। তিনি বেলুড় মঠে সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে আসবেন। তাই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে হয় পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজকে। দায়িত্ব নেওয়ার পরে তিনি এই আশ্রমেরও সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে নানা পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। পূজনীয় ভূতেশানন্দজীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁদের সকলের সাথেই তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলে পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ ও পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের দীক্ষিত কিছু ভক্ত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন। ভাবনগরের রশিদা বেন মার্চেন্টদের মুসলিম পরিবারটির সঙ্গে মহারাজের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। এই পরিবারের সকলেই রামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত। রাজকোটে থাকাকালীন মহারাজের সেবাকাজের আর এক নতুন দিগন্ত যেন উন্মোচিত হল। এই আশ্রমে থাকার সময়েই বেশ বড় আকারে রিলিফের কাজ শুরু করেন তিনি। সুরাটে তাঁর রিলিফ ও রিহ্যাবিলিটেশানের কাজ চারিদিকে বেশ সাড়া জাগায়। পরবর্তীকালে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হওয়ার পরেও এই অঞ্চলটি তিনি দেখতে গিয়েছেন।

কচ্ছের ধনেটিতে তাঁর রিলিফ ও রিহ্যাবিলিটিশানের কাজ স্মরণীয় হয়ে আছে। ধনেটি গ্রামে সেবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে। মানুষ খেতে পারছে না। অন্য জায়গা থেকেও তেমন সাহায্য তাদের কাছে তেমনভাবে পৌঁছাচ্ছে না। মহারাজ আশ্রম থেকে তাদের জন্যে খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। কিন্তু ধনেটিতে পৌঁছে শুরু হল অন্য সমস্যা। সেখানকার মানুষ মহারাজ তথা আশ্রমের আনা কোন খাওয়ার জিনিস নিতে অস্বীকার করল। তাদের এক কথা সাধুদের আনা খাবার তারা কেমন করে নেয়। অনেক আলোচনা, অনেক অনুরোধ-উপরোধেও কিছু ফল হল না। সবাই তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমন সময় হঠাৎ করে মহারাজ গ্রামের মানুষদের উদ্দেশ্যে বলে বসলেন যে, তারা যদি না খায়, তাহলে তিনিও কিছু খাবেন না, অর্থাৎ তিনি অনশন করবেন। যেমন কথা তেমনি কাজ। মহারাজ বসে রইলেন সেখানে। এদিকে গ্রামবাসীরাও দেখে, এ যে আর এক বিপদ। সাধু যদি না খেয়ে অনশন করে, সে তো তাদেরও পাপ। সুতরাং অবশেষে তারা রাজী হল মহারাজের আনা খাওয়ার গ্রহণ করতে। বস্তুত মহারাজের ভালোবাসা আর সেবাভাবের কাছে এ তাদের এক মধুর পরাজয়। এখানে মহারাজ রিহ্যাবিলিটেশানের কাজও করেছিলেন ব্যাপকভাবে। এই অঞ্চলের মানুষ তাঁকে সত্যই ভগবানের মত ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। মহারাজেরও এঁদের প্রতি এক অকৃত্রিম স্নেহ ছিল চিরকাল। পরবর্তীকালে যখন তিনি সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ, তখন এই ধনেটিতে একাধিকবার এসেছিলেন। একবার যখন তিনি ধনেটিতে পৌঁছালেন, তখন তাঁকে দেখবার জন্যে অসংখ্য গ্রামের মানুষ এসে উপস্থিত হলো। গ্রামের মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনাও জানায়। পঞ্চায়েতের একটি মেয়ে আবেগস্পর্শী ভাষায় বলে ওঠে তার বক্তৃতায়, 'রাম অযোধ্যায় ফিরে আসার পরে যেমন অযোধ্যাবাসীর আনন্দ হয়েছিল, মহারাজ আমাদের এই গ্রাম ধনেটিতে আজ ফিরে আসায় আমাদের ঠিক সেরকম আনন্দ হচ্ছে।'

বস্তুত রাজকোট আশ্রমকে কেন্দ্র করে পূজনীয় মহারাজ গুজরাটবাসীদের হৃদয়কে জয় করে নিতে পেরেছিলেন। রাজকোট আশ্রমে সেই সময় অনেক বিশিষ্ট মানুষের আনাগোনা হত। এই সময় একটি মজার ঘটনা ঘটে যা পূজনীয় মহারাজের অন্যকে আঘাত না করেও কর্ম নিষ্পন্ন করার এবং তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন হয়ে আছে। আশ্রমে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসতেন, দেখা গেল তাঁরা অনেকেই খাওয়ার থালাতে মুখ ধুতে শুরু করেছেন। সামনাসামনি তাঁদের কেউ কিছু বলতেও পারছেন না। মহারাজকে বিষয়টি জানানো হল। মহারাজ বললেন যে খাওয়া শেষ হলেই যেন তাঁদের থালাগুলি তুলে নেওয়া হয়, তাহলে স্বভাবতই তাঁরা আর মুখ ধোয়ার সুযোগ পাবেন না। তখন তাঁদের বাইরের মুখ ধোয়ার জায়গাটি দেখিয়ে দিলেই চলবে। বস্তুত এই পথ অনুসরণ করে সহজেই সমস্যাটির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেল অথচ কেউ কিছু বুঝতেও পারলেন না।

গুজরাটি ভাষা এত সুন্দর আয়ত্ত করেছিলেন যে, তাতে তিনি বক্তৃতাও দিতে পারতেন। রাজকোটে থাকার সময় তিনি ফিজি, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াতে প্রচার কাজে যান। এই সময় তিনি গুজরাট সরকারের রিলিফ কমিটির সদস্যও হয়েছিলেন।

মহারাজের খুব ইচ্ছা ছিল রাজকোটে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণের। বেলুড় মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ অনুমতি দিলেন এবং রাজীও হলেন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের, কিন্তু শর্ত দিলেন যে এই মন্দিরে কখনো ঠাকুরের অন্নভোগ দেওয়া যাবে না। পূজনীয় আত্মস্থানন্দজীও তাতে রাজী হয়ে গেলেন। সেই মত মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। মন্দির নির্মাণ কাজ যখন চলছিল, তখনকার কালের একটি ঘটনা মহারাজের মনকে খুব নাড়া দিয়ে যায়। মহারাজ প্রতিদিন সকালে মঙ্গলারতির পর পুরানো মন্দিরে জপধ্যান করে তারপর বেরোতেন নতুন মন্দিরের কাজকর্ম কতটা এগোচ্ছে তা পরিদর্শনের জন্যে। এরকম একদিন সকালে নির্মীয়মাণ মন্দিরের চারিদিকে ঘুরছেন, হঠাৎ করে দেখলেন রাতের যে প্রহরী সে ছুটতে ছুটতে মহারাজের কাছে উপস্থিত। মহারাজ দাঁড়িয়ে পড়লে সে মহারাজের পায়ের উপর পড়ে পা জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল যে মহারাজ যেন তাকে এই মুহূর্তে এই কাজ থেকে অব্যাহতি দেন। সে আশ্রমে আর কাজ করতে চায় না। মহারাজ তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকেন কেন, কি হয়েছে যার জন্যে সে এই কাজ ছেড়ে যেতে চায়। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পরে সে জানায় যে আগের দিন রাতের বেলা নির্মীয়মাণ মন্দিরের উপরে বসে রাতে যাতে ঘুম না আসে সে জন্যে একটু ধূমপান করছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখে মা কালীর মূর্তি। মা খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছেন আর বলছেন, 'তোকে এখুনি আমি কেটে ফেলব।' সে বুঝতে পারছে, তার অপরাধ হয়েছে, সেই জন্যে মা তাকে শাস্তি দিতে চান। অতএব সে আর এখানে কাজ করবে না। মহারাজের কোন কথা না শুনেই সে আশ্রমের কাজে অব্যাহতি নিয়ে চলে যায়। যাই হোক পরবর্তীকালে রাজকোটের এই মন্দিরটি মহারাজের পরিকল্পনা মতই সমাপ্ত হয়। আজো এটি মহারাজের সাধনসম্ভূত অপূর্ব কল্পনা আর নিরলস কর্মযোগের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

রাজকোটে থাকাকালীনই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এক যুবকের। জীবনজিজ্ঞাসার বিচিত্র স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে সে একদিন পৌঁছেছিল মহারাজের চরণতলে। আশ্রয় চেয়েছিল মহারাজের কাছে, চেয়েছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি। কিছুদিন পর্যবেক্ষণের পর মহারাজ নির্দেশ দেন তাকে বাড়িতে ফিরে যেতে, বলেন যে তার জন্যে অন্য বড় কাজ পড়ে রয়েছে। সময় গড়িয়ে গিয়েছে এরপর দশকের পর দশক। প্রজ্ঞাবান দূরদর্শী সন্ন্যাসীর উচ্চারিত শব্দবন্ধ ভুল হয় নি। সেই যুবক

জীবনের ভিন্নতর পথে নিজেকে বড় করে তুলেছে। রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। নরেন্দ্র মোদী। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে আজ তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার আগে একদিন তিনি বেলুড় মঠে এসেছিলেন পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে। পূজ্যপাদ সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সঙ্গে তাঁর সেই সাক্ষাৎকার হয়ে উঠেছিল যেন গুরু-শিষ্যের পুনর্মিলনের দৃশ্য। সেদিন নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'আমি যদি ভবিষ্যতে কিছু হতে পারি, তবে জানবেন তা আপনারই কৃতিত্ব, কারণ তখন যদি আমাকে আপনি না ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে তো আমি এই পথে আসতাম না।' রাজকোটে থাকার সময়েই তিনি ১৯৭৩ সালে রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। এরপর ১৯৭৫ সালে ডাক পড়ে বেলুড় মঠের মূল কেন্দ্রে সহকারী (সাধারণ) সম্পাদক হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার জন্যে।

শুরু হলো পূজ্যপাদ আত্মস্থানন্দজীর জীবনের পরবর্তী এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সহকারী (সাধারণ) সম্পাদক হিসেবে অন্যান্য নানা কাজ করা ছাড়াও তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিন এই বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। তাঁরই উদ্যোগে এই বিভাগের অর্থভান্ডার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। প্রচুর অনুদান আসতে থাকে। স্থায়ী আমানতের পরিমাণ বাড়ে। ব্যাপকভাবে রিলিফের কাজও শুরু করেন তিনি এইকালে। অন্ধ্রের ডিভিসিমা ও আরো অনেক জায়গাতে তাঁরই করা পুনর্বাসনের কাজ স্মরণীয় হোয়ে আছে। আরামবাগের বালী-দেওয়ানগঞ্জ, মালদা, গাইঘাটা এবং উড়িষ্যার কয়েকটি জায়গাতেও তাঁর ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ অনেকেই আজো মনে রেখেছেন। লক্ষ্ণৌ আশ্রমে থেকে নেপালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৭৮-এ পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়াবহ বন্যা হয়, তার ত্রাণের কার্য পরিচালনায় মহারাজের উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল দেখার মত। একবার খবর এসেছে যে মালিপাঁচঘরাতে বন্যার জল ঢুকে পড়ায় একদল মানুষ একটি স্কুল বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তারা কিছু খেতে পাচ্ছে না। তাদের কাছে ত্রাণও পৌঁছায় নি। তখন দুর্গাপূজা কাছে চলে এসেছে। পূজনীয় মহারাজ তদানীন্তন সংঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর কাছে গিয়ে সব জানালেন। ঠিক হল, মায়ের পূজার জন্যে যে চাল-ডাল এসেছে তাই এখন আর্ত্রত্রাণে ব্যবহার করা হবে। সাধুরা নিজেরা রান্না করে খিচুড়ি নিয়ে পৌঁছায় ঐ অঞ্চলে। এরপর প্রায় ১৪ টি সেন্টার থেকে পরিচালিত হয় এই বিরাট রিলিফ পর্ব। বালিদেওয়ানগঞ্জের মাটি যখন বন্যার পর দেখা গেল পুরু বালিস্তরে ঢাকা পড়ে গেছে, তখন বোঝা গেল যে প্রতি বছরের মত আর এখানকার উর্বর মাটি পাওয়া যাবে না। ফলত চাষও সম্ভব হবে না। বন্যার পরেও বন্যার অভিশাপ তখন ঐ অঞ্চলের

মানুষদের মাথায় বহন করে চলতে হবে। মহারাজের কাছে ঐ খবর পৌঁছাল। মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এক্সেল ইণ্ডাস্ট্রিজের কর্তাব্যক্তিদের। মহারাজ তাঁদের ডেকে আনলেন। তাঁদের নির্দেশ দিলেন এমন কিছু পথ বার করতে যাতে এই দুর্ভোগ থেকে স্থানীয় মানুষ রেহাই পায়। এঁরা দক্ষ ছিলেন বালি-ভরা মাটিতে চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে। এঁরা তাই উপযুক্ত একটি পদ্ধতির কথা বলে গেলেন ঐ অঞ্চলের চাষীদের। সেইভাবে চাষাবাদ আরম্ভ করে এই বিপন্ন মানুষগুলি আবার ফিরে পেয়েছে তাদের জীবনের বাঁচার পথ।

একবার ত্রিপুরায় বন্যা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধুরা প্রথম পর্বে সার্ভে করে অনেক ত্রাণসামগ্রী পেয়েছে। পূজনীয় মহারাজও প্লেনে করে সব পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। পরে দ্বিতীয় পর্বে আবার সার্ভে করে আরো কয়েকটি অঞ্চলে ত্রাণের দরকার পড়ায় তাঁকে চিঠিও লেখা হয়েছে। কিন্তু কোন কারণে সেই চিঠির উত্তর আসতে দেরী হচ্ছে। সাধুরা তখন ঠিক করেন যে, যদি বেলুড় মঠ থেকে ত্রাণসামগ্রী এসে না পৌঁছায় তাহলে প্রয়োজনে তারা ভিক্ষা করে আর্ত মানুষদের জন্যে প্রয়োজনীয় ত্রাণ জোগাড় করবেন। সে খবর পৌঁছাল মহারাজের কাছে। ত্রাণকর্মী সাধুদের এই অপূর্ব সেবাভাব দেখে মহারাজ জানালেন, 'তোমরা কাজ করো, যা প্রয়োজন আমি সব পাঠাচ্ছি।'

গ্রামের মানুষদের স্বনির্ভর করার জন্যে রামকৃষ্ণ সংঘের দশম সংঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ পরিকল্পনা করেছিলেন পল্লীমঙ্গল প্রকল্পের। কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত করার যাবতীয় ভার পড়েছিল পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দজীর উপর। এরই সঙ্গে তাঁরই উৎসাহে কামারপুকুরে মোবাইল ডিস্‌পেন্সারি ও বিনা খরচে চোখ অপারেশানের প্রকল্প সূচিত হয়। এই প্রকল্প আজো ভালোভাবে চলছে। বেলুড় মঠের পাশেই অবস্থিত শাখাকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠে গ্রামীণ যুবকদের স্বনির্ভর প্রকল্পে প্রশিক্ষিত করার জন্যে সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দিরের সূচনার পিছনেও ছিল মহারাজের সক্রিয় অনুপ্রেরণা। মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় নারায়ণপুরে অবুঝমার উপজাতিদের মধ্যে কাজ করার জন্যে আশ্রম স্থাপনা, অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে কাজ করার জন্যে নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা – সবেতেই মহারাজের এই সক্রিয় উদ্যম জড়িয়ে আছে। এই পর্বেই মহারাজ উদ্যোগ নেন বৃদ্ধ সাধুদের জন্যে মঠে একটি আরোগ্য ভবন নির্মাণের। সকলের অনুমতিক্রমে এর জন্যে অর্থসংগ্রহ করেন তিনি। এছাড়াও কর্ণাটক রাজ্যের ব্যাঙ্গালোরের নিকটবর্তী আলসুরেও সাধুদের জন্যে একটি অনুরূপ আবাস নির্মাণের ব্যবস্থা করেন মহারাজ। কাশী সেবাশ্রমের সাধু-ভক্তদের জন্যে নির্মিত বৃদ্ধাবাসও মহারাজের উৎসাহেই নির্মিত। বড়িশার বৃদ্ধাবাসের নির্মাণের পিছনেও ছিলেন মহারাজ। কামারপুকুরে যাত্রীনিবাস তৈরী মহারাজের আর একটি অসামান্য কীর্তি।

বেলুড় মঠের ভারতীয় ভক্ত ও বিদেশী ভক্তদের জন্যে নির্মিত দুটি অতিথিনিবাস সম্প্রসারণেও মহারাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা সকলেই জানেন। কাঁথি মঠ ও গৌহাটি মঠের মন্দির দুটির নির্মাণে মহারাজ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অর্থসংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

বেলুড় মঠের ঠাকুরের মূল মন্দিরের নানা সংস্কারের কাজে মন দিয়েছিলেন মহারাজ। ভান্ডারঘরের সামনে গ্রিল গেট করে দিয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে শ্রীমৎ স্বামী আদীশ্বরানন্দজীর সহায়তায় বুলেটপ্রুফ কাচ আনিয়ে লাগিয়েছিলেন ঠাকুর মন্দিরের সামনের দিকের দরজায়।

মঠে ভক্তদের যাতে গরমের দিনে খাওয়ার জলের কষ্ট না হয়, সেইজন্যে তিনিই প্রথম একটি স্থায়ী জলসত্রের ব্যবস্থা করেন। প্রথমে মাটির কলসি ও জালা রেখে তা দেওয়া শুরু হয়েছিল।

বাস্তবিকই পূজনীয় মহারাজ ছিলেন Crisis Manager। সব কিছুতেই যেন নেতার মত সামনে থেকে এগিয়ে এসে দাঁড়াতেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি শাখাকেন্দ্রে একবার একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে যায় যাতে একজন আশ্রমিকের মৃত্যু হয়। মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই সমস্যার সমাধানের জন্যে দায়িত্ব দেন। তিনি একজন সাধুকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দেন প্লেনে করে। তারপর বিমানবন্দরে নেমে সারা রাত একটি ছোট মারুতিভ্যানে করে পৌঁছে যান অকুস্থলে। সেখানে সকলের সঙ্গে কথা বলে ধীরে ধীরে পরিস্থিতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। সাহস করে যে কোন বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়ার এই অসামান্য বৈশিষ্ট্য তাঁর সঙ্গের সাধুদের মুগ্ধ করেছে চিরকাল।

এই সময়েই নানা যুব-সম্মেলনে আকর্ষণীয় বক্তারূপে উপস্থিত থাকতেন পূজ্যপাদ মহারাজ। ১৯৮০ সালের ভক্ত-সম্মেলন আর ১৯৮৫ সালের যুব সম্মেলনে Accommodation and Reception Committee-র চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন তাঁর সময়েই সর্বভারতীয় ট্রাইবাল কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় তাঁর কার্য পরিচালনার দক্ষতা সকলের নজর কেড়েছিল। বেলুড় মঠের মূলকেন্দ্রে যোগদান করতে আসা নবাগত ব্রহ্মচারীদের জন্যে তিনিই পূজনীয় গম্ভীরানন্দজীকে বলে তৈরী করেছিলেন Pre-Probationers' Training Centre (PPTC)। এইখানে যারা সঙ্ঘে যোগদানের জন্যে আসত, তাদের প্রতি এবং সাধারণভাবে যারাই নতুন সাধুজীবনে প্রবেশ করত তাদের সেই প্রথম পর্বের সাধুজীবন গঠনের প্রতি পূজ্যপাদ মহারাজের সবসময় গভীর নজর ছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৯২ সালে পূজ্যপাদ মহারাজ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক পদে বৃত হন। এই পদে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। সঙ্ঘকে এই সময় যে নেতৃত্ব তিনি প্রদান করেছিলেন, তা এই আধ্যাত্মিক

সংগঠনের ইতিহাসে মনে রাখার মত। স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক বাড়িটি অধিগ্রহণের চেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলছিল। সাধারণ সম্পাদক হয়েই পূজনীয় মহারাজ এই কাজে গতি আনার জন্যে দুইজন দক্ষ সাধুকে নিয়োগ করেন। এছাড়াও এই কাজে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের জন্যে তিনি নানা জায়গায় আবেদন করেন। ভারতের এবং বিদেশের নানা স্থান থেকে অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। সবচেয়ে বেশী সাড়া এসেছিল স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। কিছু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে সেই অর্থ পাঠিয়েছিল এই কাজে সহায়তার জন্যে। তাঁরই একান্ত আগ্রহে লিমডি ও পোরবন্দরে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-বিজড়িত দুটি বাড়ী অধিগ্রহণ করা হয়।

১৯৯৭-এর বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে এই সঙ্ঘের অন্যতম সহ-সংঘাধ্যক্ষের পদে বৃত হলেন আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। সহ-সংঘাধ্যক্ষ হওয়ার পরে তিনি ১৯৯৮ সালে আমেরিকা, কানাডা, জাপান ও সিঙ্গাপুরের শাখাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এক সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী পার্ষদের দীক্ষিত সন্তানকে পেয়ে তাঁরাও নিজেদের ধন্য বলে বোধ করেছিলেন। বাংলাদেশেও তিনি গিয়েছেন এবং সেখানকার ভক্তদের মন্ত্রদীক্ষা দান করে কৃতার্থ করেছেন। ২০০৭ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পঞ্চদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষের পদে বৃত হন।

মহারাজের বাইরেটা ছিল আপাত কাঠিন্যে ভরা। কিন্তু ভিতরের মনটা ছিল অতি কোমল। শুধু তাই নয়, এক বিশাল হৃদয় তাঁকে অনেকের মধ্যে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। তাঁর কাছ যারাই এসেছে, তারাই তাঁর এই অপূর্ব সংবেদনশীল মনের পরিচয় লাভ করে ধন্য হয়েছে। পিপিটিসি-র এক ব্রহ্মচারী কিছুদিন আগে সঙ্ঘে যোগ দিয়েছে। মহারাজের কাছে এসেছে একটি প্রয়োজনীয় খাতা সই করাতে। হঠাৎ মহারাজ দেখেন তার চোখটা লাল। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করলেন, কেন লাল, কী হয়েছে ইত্যাদি। শুনে-টুনে নির্দেশ দিলেন, 'এক্ষুনি ডাক্তার দেখিয়ে আয়।' ব্রহ্মচারীটি ইতস্তত করছে, কারণ তার দায়িত্ব আছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহারাজকে দিয়ে ওই খাতাটি সই করাতে হবে। কিন্তু মহারাজের স্পষ্ট বক্তব্য, আগে সে চোখ দেখিয়ে আসুক, পরে খাতা সই হবে। সদ্য আগত এক তরুণ ব্রহ্মচারীর প্রতি এই ভালোবাসা আজো গভীর শ্রদ্ধায় মনে করে মাঝবয়সী সেই সাধুটি।

তাঁর অকপট স্নেহের এরকম অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের সাধুদের মধ্যে, বিশেষত যারা সঙ্ঘে যোগদান করেছে তাঁর কাছে বেলুড় মঠে পিপিটিসি-তে। এক যুবক সদ্য যোগদান করেছে মঠে। গ্রীষ্মকাল। পাখা নেই ঘরে। স্বভাবতই খুব গরম। শরীরে ঘামাচির জ্বালা হচ্ছে খুব। সরল ব্রহ্মচারীটি সোজা গিয়ে মহারাজকে আবদার জানায় ঘামাচির জ্বালা জুড়ানোর মত

কোন পাউডার পাওয়া যায় কিনা। শুনেই মহারাজ তো রেগে উঠলেন; সোজা মুখের উপর বলে দিলেন, 'ওসব পাউডার-ফাউডার কিছু হবে না। সাধু হতে এসেছো, কষ্ট করো। প্রয়োজনে ছাই মেখে বসে থাকো।' ব্রহ্মচারীটি চুপচাপ ফিরে চলে আসে। ঘটনাটির একদিন পরেই উক্ত ব্রহ্মচারীর পূর্বাশ্রমের কয়েকজন তার সাথে দেখা করতে মঠে আসে। তাদের মধ্যে ব্রহ্মচারীটির দাদা ও দিদি ছিল। তারা ভাইয়ের খোঁজ করতে পূজনীয় মহারাজকেও দর্শন করতে যায়। মহারাজ তাদের পরিচয় পেয়েই বলে ওঠেন, 'তোমরা কিরকম দাদা-দিদি হে ? ঘামাচির জন্যে ভাইয়ের কষ্ট হচ্ছে, আর তোমরা তার জন্যে একটা পাউডার কিনে আনো নি ?' তারা তো শুনে অবাক। এর পরেই তারা যখন দেখা করতে এল, তখন সাথে নাইসিল পাউডার। আপাত কঠিনতার অন্তরালে এমনই এক সংবেদনশীল স্নেহপ্রবণ মন নিয়ে এই বিরাট সঙ্ঘের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। হয়ে উঠেছিলেন আশা-ভরসার স্থল।

আবার এদেরই সাধুজীবন গঠনের দিকে কত নিখুঁত দৃষ্টি ছিল তার। মহাষ্টমীর দিন অফিস যাওয়ার আগে ব্রহ্মচারীদের ডেকে বললেন, 'হ্যাঁরে, গতকাল রাতে যেমন তোদের বলেছিলাম, তেমনই নির্জলা উপবাস করছিস তো তোরা সবাই ?' সবাই জানালো যে, পূজনীয় মহারাজের নির্দেশ তারা পালন করছে। এদিকে তাদেরই জন্যে নিজে জোগাড় করে রেখে দিয়েছেন কলা, যাতে তারা কিছু অন্তত মুখে দিতে পারে।

কখনো আবার কোন ব্রহ্মচারীকে ডেকে পাঠিয়েছেন কোন কাজের জন্যে, কিন্তু সে এসে পৌঁছানোর পরে আর তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। বার কয়েক সেই ব্রহ্মচারীটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যায়, আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একবার ডেকে পাঠালেন আর কাজটি করতে করতে বললেন, 'কিরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলিস না ?' যে ধৈর্য সাধুজীবনের অর্জনীয় সম্পদ, নবাগত সাধুদের জীবনে তা প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্যেই তার এই পরীক্ষা গ্রহণ।

কোন এক ব্রহ্মচারী একটি সেণ্টারে যাবে, তাকে মঠ থেকে পোস্টিং করা হয়েছে। মহারাজের কাছে আসার পর তিনি তাকে ধৈর্য ধরে বোঝালেন কেমনভাবে থাকতে হবে ইত্যাদি। শেষে বললেন, 'আশ্রমের যিনি মহান্ত মহারাজ আছেন, তাকে জানবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিনিধি। সেইমতো তিনি যেমনটি বলবেন, তেমনটি করবে।' এই প্রশিক্ষণ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক সাধুর অপূর্ব জীবন তৈরীতে সাহায্য করেছে – তাঁরা আজো তাই মহারাজকে স্মরণ করে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে।

মানুষের জন্যে কাজ করাকে, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শকে তিনি বিরাট মান্যতা দিয়ে গেছেন চিরকাল। আর্ত মানুষের কল্যাণের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করার ব্রত নিজে নিয়েছিলেন,

অন্যের মধ্যেও সেই ভাব সঞ্চার করে দিয়ে গিয়েছেন। একবার একটি আলোচনায় ঠিক হচ্ছে যে কোন একটি আশ্রমের ডিস্‌পেন্‌সারি ঠিকঠাক চলছে না, সুতরাং সেটি উঠিয়ে দিলেই ভাল হয়। সকলেই যখন প্রায় এই প্রস্তাবের পক্ষে, তখন হঠাৎ পূজনীয় মহারাজ বলে উঠলেন, 'সেকি এতে লোকের কিছু কল্যাণ তো হচ্ছে, আর এটি তোমরা বন্ধ করে দেবে ?' বলা বাহুল্য মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এই উপলব্ধিবান সাধকপ্রবরের ছোট্ট প্রশ্নটির মধ্যেই লুকিয়েছিল করণীয় ইঙ্গিত – উপস্থিত কারুরই তা বুঝতে অসুবিধ হয় নি।

আশ্রমের কর্মীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সে ব্যাপারে তাঁর লক্ষ্য ছিল অবিচল। একবার কলকাতার একটি কলেজের অধ্যক্ষ জানান যে, পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যাশিয়ার সন্ন্যাসীর ব্যাগ থেকে চুরি গেছে ট্রেজারি যাওয়ার পথে। এটি কর্মীদের পিএফের টাকা। আশ্রম-সচিব মহারাজও কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। কলেজের অধ্যক্ষ পূজনীয় মহারাজের কাছ থেকে পরামর্শ চাইলেন। মহারাজ স্পষ্ট জানালেন যে, প্রথমে আশ্রম থেকে ধার নিয়ে ট্রেজারিতে টাকা জমা দিতে হবে যাতে কর্মীরা একদিনের সুদও কম না পায়, তারপর আইনানুগ ব্যবস্থাগুলির কথা ভাবতে হবে।

প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে একটা Perfection রাখার ব্যাপারে নজর দিতেন যত্ন করে। জামা-কাপড় সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতেন। একবার এক সেবকের একটু অগোছালো জামা-কাপড় দেখে বলছেন, 'এমন কেন ?' সেবক জানায়, 'ইস্ত্রি তো নেই, কি আর করা যাবে ?' শুনে মহারাজের উত্তর, 'কেন, সুন্দর করে ভাঁজ করে বালিশের তলায় রেখে দিলেই হয়।' ঘরের পর্দাগুলিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন তিনি। ছবিগুলি যেন একটু বেঁকে না থাকে, সেদিকেও সতর্ক নজর থাকত পূজনীয় মহারাজের। অর্থাৎ সব কাজের মধ্যে একটা শ্রী-কে ফুটিয়ে তোলার সহজাত প্রয়াস ছিল তাঁর জীবনসাধনারই অঙ্গ।

যাঁরাই তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা আজো স্মরণ করেন যে ঐ ভাবে কাজ করাটাই যেন একটা অ্যাডভেঞ্চার। Division of labour-এ বিশ্বাস করতেন তিনি খুব গভীরভাবে। অন্যের উপর ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। যাঁকে দায়িত্ব দিতেন তাঁকে পুরোদস্তুর বিশ্বাস করে চলতেন, যদিও খবর রাখতেন যে সে কতটা এগোতে পারল, কতটা বা পারল না। তাঁর বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রতি বক্তৃতাই যেন শেষ হত কোন আবেদনের মাধ্যমে, শ্রোতাদের কাছে কিছু করার প্রস্তাব বা নির্দেশ দিয়ে। বক্তৃতায় নোট তৈরী করতেন কদাচিৎ। নিজের ভিতর থেকে এক অনবদ্য স্বতস্ফূর্ততায় বলতে শুরু করতেন, পৌঁছে যেতেন শ্রোতার একেবারে কাছে। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব সবসময় পৌরুষের দীপ্র ছটা বিচ্ছুরিত করত। মিন্‌মিনে ভাব তাঁর কাছে আদৃত হয় নি। নিজে রান্না করতে পারতেন ভাল।

বিরজানন্দজীর কাছ থেকেই নাকি শিখেছিলেন রান্নার নিয়মকানুন। ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট আর বিদেশভ্রমণ - এই দুটিতেই তার একটু হলেও অনীহা দেখা যেত।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ছিলেন সাধারণ। সাত্ত্বিক আহার পছন্দ করতেন বেশী। বেশী তেল-মশলা দেওয়া খাবার একেবারেই পছন্দ ছিল না তার। তবে যেখানেই যান না কেন, প্রসাদের উপর গভীর ভক্তি ছিল পূজ্যপাদ মহারাজের। আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর খাওয়ার ক্ষেত্রে। খাওয়ার তালিকায় যেটি যে ক্রমে আসার কথা, সেই ক্রম ভেঙে কখনোই আগে-পরে কোন জিনিসকে খাওয়া পছন্দ করতেন না তিনি। সেক্ষেত্রে কাউকে যে কিছু বলতেন, তা নয়, কেবল ঐ খাওয়ারটি সেদিন তাঁর খাওয়া হত না। সাধারণত পছন্দ করতেন না যে, খাওয়ার সময় কেউ তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকুক। খাওয়ার পরিবেশন করা হয়ে গেলে, নিজেই ধীরে ধীরে খেয়ে উঠে যেতেন।

সেবকদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অগাধ। তাদের সুখ-দুঃখের দিকে নজর দিতেন সবসময়। নিজের যে খাওয়ারটি ভালো লেগেছে, সেটিকে আলাদা করে তুলে রাখতেন সেবকদের জন্যে। যখন তিনি সহকারী (সাধারণ) সম্পাদকের পদে রয়েছেন, সেই সময় গুজরাট থেকে মঠে আসা এক নবাগত ব্রহ্মচারীর শরীর খারাপের কথা শুনে তাকে ডেকে পাঠান। স্থানান্তরের কারণেই জল প্রভৃতি পালটে যাওয়ায় ব্রহ্মচারীটির হজমের সমস্যা হচ্ছিল। দিন দিন তার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে শুনে, একদিন তিনি তাকে ডেকে পাঠান নিজের ঘরে। নিজের টিফিনের থেকে আলাদা করে রাখা বেশ খানিকটা টিফিন খাওয়ান ব্রহ্মচারীটিকে। এরপর থেকে বেশ কিছুদিন এই বরাদ্দ ছিল ব্রহ্মচারীটির জন্যে। সেদিনের ব্রহ্মচারী আজ একটি আশ্রমের প্রধান ও প্রবীণ সন্ন্যাসী। কিন্তু সেই প্রায় চার দশক আগের ঘটনাটি বর্ণনা করার সময় যেন তা প্রত্যক্ষ দেখতে পান। মহারাজের ভালোবাসার কথা আজো স্মরণ করেন তিনি উচ্ছল আনন্দে।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে পূজ্যপাদ মহারাজের যোগাযোগ তৈরী হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যে অংশ নেওয়ার জন্যে অনেক শিল্পপতি ও ট্রাস্টকে তিনি কাছে টেনে এনেছিলেন নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-মাধুর্য দিয়ে। এক দরাজ গলায়, খোলামেলা উচ্ছল হাসির জোয়ারে, অকপট স্নেহের আবাহনে, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শের ঋজু উপস্থাপনে এঁদের তিনি ডেকে আনতে পারতেন সমাজের কল্যাণে, সংঘের কাজে তাদের নানাভাবে যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। বিড়লা গোষ্ঠী, বাজাজ কোম্পানি, বোম্বে সমাচার গ্রুপ, অরবিন্দ টেক্সটাইল্‌স্‌, পিয়ারলেস গ্রুপ, বিজয়াবেন গান্ধীদের পরিবার, এক্সেল ইন্ডাস্ট্রিজ, ভুয়ালকা ট্রাস্ট, আনন্দবাজার গ্রুপ প্রভৃতিরা মহারাজের এই অসামান্য ব্যক্তিত্বের আকর্ষণকে কোনদিন ভুলতে পারে নি।

মঠে যখনই কোন ভি আই পি আসতেন, সহকারী (সাধারণ) সম্পাদক থাকাকালে তাঁরই উপর ভার পড়ত তাঁদেরকে আপ্যায়ন করার। ফলত অনেকের সাথেই তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর একটি অসামান্য পত্রালাপ রয়েছে। ১৯৮৪ সালের শুরুর দিকে ইন্দিরা যখন গ্রামের উন্নয়নের কথা ভেবে National Rural Development Fund গড়ে তুলতে আগ্রহী হন, তখন মহারাজ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে একটি চমৎকার চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে মহাভারতের সভা পর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের করা দেশের কৃষি, গোধন এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করে পাঠান তিনি। ইন্দিরা চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করেন এবং এর জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদও জানান।

বালিদেওয়ানগঞ্জের ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প শেষ হওয়ার পরে গ্রামের মানুষের হাতে সব কিছু তুলে দেওয়ার মুহূর্তে একটি অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রী টি এন সিং, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু ও পূর্তমন্ত্রী শ্রী যতীন চক্রবর্তী মহাশয়কে। পূজনীয় মহারাজের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের সেই অসামান্য কাজের দৃষ্টান্ত দেখে শ্রী বসু যতীনবাবুকে বলেন, 'আচ্ছা যতীনবাবু, আপনাদের দপ্তর এমন কাজ করত পারে না কেন?'

এই সময় ঐ স্থানে দিঘতার গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় বন্যায় ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মিশনের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়টি পুনর্নির্মিত হয়। এর উদ্বোধন করালেন তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় একবার ত্রাণের কাজের জন্যে সরকারের বিশেষ কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় রাজনৈতিক মতাদর্শাদি কারণে মিশনের প্রতি একেবারেই অনুকূল ছিলেন না। পূজনীয় মহারাজের পূর্বাশ্রমের এক ভাই শ্রী প্রীতীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে তিনি সরাসরি উপস্থিত হন সেই মন্ত্রীর কাছে। কিছু কথাবার্তার পর যখন তিনি মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানালেন বেলুড় মঠে আসতে, তখন মন্ত্রী বলে উঠলেন যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি যেতে চান না। মহারাজ শুনে প্রায় গর্জে উঠলেন। উপস্থিত সকলে তো বেশ অবাক। কিন্তু দেখা গেল যাকে তিনি বলছেন তিনি চুপ করে শুনলেন সব কথা এবং স্বীকার করলেন নিজের সীমাবদ্ধতার কথা। তারপরে আরো কিছুক্ষণ কথা হল। দেখা গেল সেই মন্ত্রী কেমন যেন পূজনীয় মহারাজের কাছের মানুষ হয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে সেই মন্ত্রী এসেছেন প্রায় মঠের ভিতরেই অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। মঠ-মিশনকেও সাহায্য করেছেন নানাভাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ছাত্র ছিলেন। একদিন কোন একটি কাজে তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। তাঁকে দেখেই রাধাকৃষ্ণান উঠে দাঁড়িয়েছেন। পূজনীয় মহারাজ ভেবেছেন রাধাকৃষ্ণান নিশ্চয়ই

ছাত্র হিসেবে তাঁকে চিনতে পারেন নি। কিন্তু নিজের পরিচয় যেই দিতে যাবেন, রাধাকৃষ্ণান বলে উঠলেন যে তিনি তাঁকে যথেষ্টই মনে রেখেছেন। পূজনীয় মহারাজ বললেন, 'তাহলে আপনি উঠলেন কেন ? আপনি তো আমার শিক্ষক, গুরু।' রাধাকৃষ্ণান উত্তর দিলেন, 'যখন তুমি ছাত্র ছিলে, তখন আমি তোমার শিক্ষক ছিলাম, গুরু ছিলাম। কিন্তু আজ তুমি সন্ন্যাসী, তুমি জগতগুরু।'

গুজরাটের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল চিরকাল। সেখানকার আশ্রমের প্রবীণ সাধুদের গুজরাটি নববর্ষের দিনে সকালবেলা নিজেই টেলিফোনে গুজরাটি প্রথামত 'সাল মুবারক' বলে নববর্ষের অভিবাদন জানাতেন। স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত পোরবন্দর ও লিমডি তাঁর উৎসাহে আগেই নেওয়া হয়েছিল। সহ-সংঘাধ্যক্ষ হওয়ার পরে গুজরাটের একটি আশ্রমের এক প্রবীণ মহান্তকে ডেকে বলেন আব্দারের সুরে, 'তুমি আমাকে বরোদার স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত দিলারাম বাংলোটি এনে দাও। আমি চলে যাওয়ার আগে যেন এটি দেখে যেতে পারি।' অর্থাৎ দিলারাম বাংলো যা কিনা সরকারের অধীনে তাকে রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে এনে একটি শাখাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সেই সাধুটি সমস্ত উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই কাজে। যোগাযোগ করলেন সেই সময়ের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। মোদীজীকে শোনালেন আত্মস্থানন্দজীর কথা। মোদীজী রাজী হলেন বাড়িটি হস্তান্তর করে দিতে। কেবল একটি শর্তে, বললেন, 'মহারাজজীকে আসতে হবে, আমি মহারাজজীর হাতে বাড়িটি তুলে দেবো, আপনার হাতে দেবো না।' সেই আবদারে পূজনীয় মহারাজও উপস্থিত হয়েছিলেন দিলারাম বাংলো হস্তান্তরের দিন – ২০০৫-এর ১৮ এপ্রিল, রামনবমী তিথিতে। সেই অনুষ্ঠানে মহারাজ তাঁর আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছেন না। মোদীজীকে বলেছিলেন, 'বেলুড় মঠে এসো, প্রসাদ খাওয়াবো।' পূজনীয় মহারাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন মোদীজী। ২০১৩-তে মঠে এসে পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

এই সঙ্ঘ, তার প্রতিটি সাধু-ব্রহ্মচারী সদস্য, তার প্রতিটি শাখাকেন্দ্র, তার সেবাকাজ – সবকিছুকে তিনি ঠাকুরের বিকাশ বলেই প্রত্যক্ষ করতেন। কি অপূর্ব শ্রদ্ধা ছিল এই সব কিছুর উপরে। তাঁর থেকে যাঁরা প্রবীণ, তাঁদের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেন সব সময়। প্রবীণ সাধুদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল ছোটদের কাছে অনুকরণীয়। প্রবীণরা কেউ যদি তাঁকে প্রণাম করতে আসত, তাহলে তিনি নবীনদের একটু দূরে সরে যেতে বলতেন। পূর্বের সঙ্ঘাধ্যক্ষ, সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য প্রবীণ সাধুদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন – বিভিন্ন আলাপচারিতায় তাঁদের কথা মাঝেমাঝে উঠে আসত। পরবর্তীকালে সন্ধ্যারতির ঠিক পরে অল্পক্ষণের জন্যে মঠের কার্যাবলী

পরিচালনার মূল দায়িত্বে থাকা প্রবীণদের একটি চায়ের আসর বসত তাঁর ঘরে। প্রেসিডেন্ট মহারাজ হিসেবেও যতদিন মঠে ছিলেন, এই আসর তাঁর উদ্যোগে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

সাধুজীবনের প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেতো অন্য নানা আচরণেও। একবার একটি আশ্রমে সাধুদের সঙ্গে সাধারণ আলাপচারিতায় বসবেন বলে বসেছেন। নিজের ছাড়া জুতো জোড়া রয়েছে তাঁর পায়ের কাছে। পাশে থাকা এক যুবককে বললেন, জুতোজোড়াটি সরিয়ে রাখতে, কারণ সাধুরা সব এখানে বসবে। আশ্রমের একজন সন্ন্যাসী বললেন, 'কী দরকার আছে মহারাজ, জুতো সরাবার, আমরা এর পাশেই ঠিক বসে যাব।' উনি সঙ্গে সঙ্গে জোড় হাত করে বললেন, 'কি বলছো, সাধুরা আসবে, তাদের সামনে আমার চটি রেখে দেবো ? তা কখনো হয় ?'

তরুণ সাধুদের সাধুজীবন গঠনের উপর যেমন জোর দিতেন, নজর রাখতেন তাদের বিকাশের দিকে, তেমনি খেয়াল রাখতেন সাধুদের শরীর স্বাস্থ্যের দিকেও। অনেক সাধুকে চিকিৎসা করিয়েছেন ভালো হাসপাতালে রেখে। অথচ নিজের শরীর খারাপের কথা সাধারণভাবে কাউকে বলতেন না। শরীর যদি খুব খারাপ হতো এবং দেখতেন নিজে আর কোনমতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, তখনই ডাকতেন সেবকদের। কষ্ট সহ্য করার এই ভাবটি তাঁর কাছ থেকে ছিল শেখার মত।

একবার আলং আশ্রমে গেছেন। সেই আশ্রম-বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক তাঁকে একটি খুব দামী জুতো উপহার দিতে আসে। মহারাজ প্রথমে খুশী মনে তাঁর সেই উপহারের বৃত্তান্তটি শোনেন। কিন্তু পরে বলেন যে তিনি সেই উপহার নিতে অপারগ, কারণ, এত দামী জুতো সাধু হয়ে তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না, সেটি তাঁর সাধুজীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। আর ভক্তটিরও উচিত এমন ক্ষতি যাতে না হয় সেরকম করা। শুনে সকলেই চমৎকৃত।

কখনো কখনো তাঁর মধ্যে শিশুস্বভাবের এক অপূর্ব বিকাশ দেখা যেত। সেই স্বভাবের প্রভাবে কাছে থাকা সকলেই অনুভব করতে পারতেন নিখাদ মজা, আনন্দ। তখন তিনি সহকারী (সাধারণ) সম্পাদক। সাধারণ উৎসবের মেলা থেকে একটি মজার দেখতে পুতুল কিনে রেখে দিয়েছেন আর এক প্রবীণ সাধুর টেবিলের উপর। প্রবীণ সাধুটি প্রথমে তা দেখে খুব একটা খুশী হতে পারেন নি। চারিদিকে তিনি খোঁজাখুঁজি শুরু করেছেন, কে এমনটা করল ? একে ডাকেন, তাকে ডাকেন, একটু বকাবকিও করতে থাকেন। এদিকে মহারাজ কিন্তু চুপচাপ বসে মজা দেখছেন। একটু পরে নিজে গিয়ে বললেন, যে এসবের পাণ্ডা তিনিই আর তার একটি উপযুক্ত কারণও বর্ণনা করে দিলেন। সব শুনে সংশ্লিষ্ট প্রবীণ সাধু সহ সকলেই তখন হাসিতে উচ্ছল।

বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় এক পূজক সন্ধ্যারতি করতে গিয়ে কর্পূর আরতির গরম তরলে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে। আরতির শেষে সকলেই তার শুশ্রূষা করতে ব্যস্ত। মহারাজ মাকে প্রণাম করে ভাণ্ডারঘর দিয়ে যাওয়ার সময় গম্ভীর গলায় বলে গেলেন, 'কোন চিন্তা নেই, তুমি স্বামীজীর কথার ধার দিয়েই গেছো। স্বামীজী বলেছিলেন মাকে রুধির দিয়ে পূজা করতে হবে। তুমি একটু পালটে নিয়ে মাকে হাত পুড়িয়ে পূজা করলে।' চারিদিকে হাসির রোল উঠল।

একবার তাঁর একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। সেবক তাঁকে আসলে ডাবের জলটা একটু ঠাণ্ডা করে দিয়ে ফেলেছিল। হয়ত তাতেই তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছে। শিশুস্বভাব মহারাজ তা মানতে নারাজ। তাঁর যুক্তিটি ভারী মজার। তিনি বলছেন যে আসলে ডাবের জলে পোকা পড়েছিল। ডাবের জল খাওয়ার পরে সেই পোকা প্রথমে পেটে চলে যায়। তারপর পেট থেকে উঠে এসে সে গলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সেবক তো শুনেই হেসে কুটিপাটি।

একবার বাংলাদেশ থেকে দুজন সাধু এসেছেন মহারাজের কাছে। পূজনীয় মহারাজকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেই তাঁর হাতে তারা চারটি ফক্স লজেন্স তুলে দিলেন। এটি মহারাজের অত্যন্ত প্রিয় জিনিস ছিল। সুতরাং এটি হাতে পেয়ে তিনি তো শিশুর মত খুশী। এরপর তারা আবার একটি বিদেশী জুসের প্যাকেট পূজনীয় মহারাজের হাতে তুলে দিলেন। মহারাজ সেটি হাতে নিয়েই জিজ্ঞাসা করছেন, 'এটি কী ?' তারা বললেন যে এটি এমন একটি জিনিস যা খেলে ভীতুরা নির্ভয় হয়। মহারাজ চোখ দুটি বড় বড় করে বললেন, 'তার মানে, আমি কি ভীতু নাকি ?' সাধুদ্বয় জোড় হাতে মজার ছলে জানালেন, যে তাদের তো তেমনই মনে হয়। যেমন শিশুরা ভীতু হয়, তেমন আর কি। পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, 'কেন ?' তাদের উত্তর, 'মহারাজ আপনি নাকি বাংলাদেশে ভয়ে যেতে চান না ?' পূজনীয় মহারাজ স্বীকার করলেন এবং জানালেন সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা। কিন্তু এই সাধু দুজনেও নাছোড়। অবশেষে মহারাজ শিশুর মত হেসে উঠে বললেন তাঁর সচিব-সেবক মহারাজের সাথে কথা বলে দিনক্ষণ ঠিক করতে।

একবার খুব পরিশ্রমী মধ্যবয়সী এক সাধু সাইকেল রিক্শা করে প্রচারকার্যে গিয়ে কাছাকাছি সময়ের মধ্যে দুবার দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। দুবারেই তার আঘাত বেশ গুরুতর ছিল। কিন্তু স্বামীজীর আদর্শে প্রাণিত সেই সাধু তারপরেও না দমে আবার একইভাবে আর একবার প্রচারকার্যে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় এবং অল্পবিস্তর আহতও হয়। পরে মহারাজ ফোন করে তাকে বলেন, 'ওহে ন্যাড়া বেলতলায় কবার যায় ?' মজার ছলে কথাটি বললেও স্নেহময় মহারাজ আসলে সাধুটিকে

ভবিষ্যতের জন্যে একটু সতর্ক করতেই চাইলেন। আজকের প্রবীণ সন্ন্যাসী সেই সাধুটি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন ঘটনাটি।

নিজের এক সেবকের নামের সঙ্গে কৃষ্ণের নামটি মিশে ছিল। তাকে সামনে পেয়েই একদিন জিজ্ঞাসা যে, এই কৃষ্ণের বাঁশি কোথায় ? সেবক মোবাইল ফোনটি দেখালে, তিনি বলে ওঠেন এটা তো মোবাইল ফোন, বাঁশি হবে কেন ?

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি শাখাকেন্দ্রে যাওয়ার জন্যে সেই শাখাকেন্দ্রের মহান্ত মহারাজ একটি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করেন। সেখানে উঠে তাঁর শিশুর মতন আনন্দ। বারবার বলছেন যে তাঁর অনেকদিন একটি হেলিকপ্টারে ওঠার ইচ্ছা ছিল। এইবার তা পূর্ণ হওয়ায় তিনি খুব খুশি হয়েছেন। বস্তুত এই জন্যে সেই সন্ন্যাসীকে তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন।

যুবকদের প্রতি বরাবরই খুব আকর্ষণ ছিল পূজনীয় মহারাজের। তাদের তিনি সহজেই কাছে টেনে নিতে পারতেন। বেলুড় মঠে একবার যুবদিবস পালন হচ্ছে ১২-ই জানুয়ারি। মহারাজ তখন সহকারী (সাধারণ) সম্পাদক। বেশ কিছু গান, আবৃত্তি, বক্তৃতাদি হয়েছে। বেলাও বাড়ছে। ছাত্রছাত্রীরাও বেশ অধৈর্য হয়ে উঠছে। একেবারে শেষে মহারাজ উঠলেন সভাপতির ভাষণ দিতে। তখন সভামণ্ডপে বেশ হৈ-হট্টগোল চলছে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই মহারাজের হঠাৎ প্রশ্ন, 'হ্যাঁরে, তোদের খুব খিদে পেয়েছে না ?' সবাই সমবেত স্বরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ'। মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'আমারও খুব খিদে পেয়েছে বুঝলি, কিন্তু আমাকেও যেতে দিচ্ছে না, দেখ কেমন স্টেজের উপর বসিয়ে আটকে রেখে দিয়েছে।' ব্যস্, আর কিচ্ছু দরকার পড়ল না – হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল সেই হাজার হাজার কিশোর-কিশোরীর সমাবেশ। তারপর পায় ১৫ মিনিট ধরে চলল এক অদ্ভুত মজলিস। পূজনীয় মহারাজ যেন গল্প করছেন সেই বিরাট যুবসংঘের সাথে। কোথায় হৈ-চৈ, কোথায় অস্থিরতা ? সবার চোখ আর কান তখন পূজনীয় মহারাজের দিকেই।

বিদ্যামন্দিরের এক ছাত্র মহারাজের কাছে খুব যাতায়াত করত। ছুটি থাকায় ছেলেটি বেশ কিছুদিন মহারাজের কাছে আসতে পারে নি। মহারাজ তার খোঁজ পাঠিয়েছেন, পরে ছেলেটি যখন খবর পেয়ে এসেছে, দেখে মহারাজ তার জন্যে খাওয়ার সাজিয়ে আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। তার সেই অপার ভালোবাসার কথা আজো কিশোরটি ভুলতে পারে নি – হয়ত সেই আকর্ষণই তাকে ঘর ছাড়া করেছে শেষ পর্যন্ত।

প্রথম জীবনে চাকরি পাওয়া এক যুবককে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, 'I want you to be a born executive. এমনভাবে চিন্তা করবে যেন লোকে বলে যে, আগামী পঞ্চাশ বছরেও কেউ এমন ভাবতে পারবে না'।

আর এক যুবক তাঁর কাছে আসত। সে মঠের স্বেচ্ছাসেবকও বটে। বি কম পরীক্ষা পাশ করেছে সে। সেই খবর মহারাজ জানার পর তার পিঠে হাত দিয়ে বলছেন, My happiest congratulations। সেদিনের সেই যুবক আজ সংঘের সন্ন্যাসী – আজো সেই স্নেহস্পর্শ ভুলতে পারে নি সে – 'সেই হাত আজো যেন পিঠে লেগে আছে মনে হয়।'

তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে অনেক যুবক যোগ দিয়েছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে, তাঁর নির্দেশমত গড়ে তুলেছে তাদের সাধনজীবন। সেই একই প্রভাব পৌঁছেছে যুবতীদের মধ্যেও, যার ফলে দেখা যায় অনেকে যোগ দিয়েছে সারদা মঠে, যাপন করছে ত্যাগের জীবন। সহ-সংঘাধ্যক্ষ বা সংঘাধ্যক্ষ হিসেবে যখন তিনি দীক্ষা দিতেন অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্যে আলাদা আলাদা দিন রাখতেন। যে যুবশক্তির মধ্যে স্বামীজী তাঁর সমস্ত আশা-ভরসা অর্পণ করে গিয়েছিলেন, পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দজী সেই যুবশক্তির জাগৃতির জন্যে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় এগিয়ে এসেছিলেন। বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের সাথে তাই পূজ্যপাদ মহারাজের একটি নিবিড় যোগ ছিল। যেসব যুবক সঙ্ঘে যোগদান করত, তাদের তিনি উৎসাহ দিতেন এই বলে, 'তোমরা হলে স্বামীজীর সৈনিক, তোমাদের সব কাজের জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সংঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীরা সকলেই স্বীকার করেন যে মানুষ চেনার বা কাজের লোক চেনার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। হয়ত দেখা গেল, কোন যুবক সঙ্ঘে যোগদানের ইচ্ছা নিয়ে এসেছে – অনেকেই মনে করছে ছেলেটি পারবে, কিন্তু মহারাজ বললেন যে সে পারবে না, পরে দেখা গেছে, মহারাজের কথাটাই ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোন্ কাজে কাকে দিতে হবে, সে বিষয়েও পূজনীয় মহারাজের একটি অনুপম দক্ষতা ছিল। স্বামীজীর পৈত্রিক বাড়ির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দুইজন দক্ষ সাধুকে নিয়োগ করার বিষয়টি আজো সকলে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। রাজকোট আশ্রমে যখন গুজরাটি ভাষার পত্রিকা চালু হবে ঠিক করা হয়েছে, তখনো তার প্রথম সম্পাদক কাকে করা হবে, এই ব্যাপারে মহারাজের সিদ্ধান্ত সকলেই মেনে নিয়েছেন। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, পূজনীয় মহারাজ যোগ্য হাতেই এই কাজ সমর্পণ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ সংঘের মূল যে আধ্যাত্মিকতা, মহারাজ ছিলেন তার যথার্থ ধারক ও বাহক। যে বিরাট উত্তরাধিকার তাঁর জীবনে অর্জন করেছিলেন বিরাট মাপের সাধক-সন্ন্যাসীদের সংগ করে, সেই

উত্তরাধিকার তিনি যেন বিতরণ করে দিয়ে গেছেন পরবর্তীকালের জন্যে – তাঁর প্রতিটি আচরণ, শিক্ষাদান ও আলাপে-সংলাপে এর প্রমাণ মেলে। ভগবদ্ভক্তি তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। দীক্ষাদানপর্ব শুরু হওয়ার সময় থেকেই গুরুশক্তির অনন্য বিকাশ সকলেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতে দেখেছে।

যেখানেই দীক্ষা দিতেন, সেখানেই ঠাকুরের পূজা-ভোগরাগাদি করাতেন। সেই প্রসাদ নিজে গ্রহণ করতেন। সকলকে দেওয়াতেন। দীক্ষাদান পর্ব শুরু হওয়ার আগে ঠাকুর-মার স্তোত্র-গান ইত্যাদি হত। আর দীক্ষাদান পর্ব সমাপ্ত হলে করা হত 'রামকৃষ্ণ শরণং' গানটি দিয়ে। মহারাজ এই গানটির সঙ্গে জুড়েছিলেন 'জয় মা জয় মা' ধ্বনিগুচ্ছটিকে একই সুরে। দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তদের মনে সে ছবিটিও দৃঢ়ভাবে আঁকা হয়ে গেছে।

এক জায়গায় দীক্ষাদান পর্ব শেষ হয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল, এক ভক্ত মহিলা খুব কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, পূজনীয় মহারাজ যে মন্ত্র তাকে দিয়েছেন, স্বপ্নে সেই মন্ত্রই তিনি আগে পেয়েছিলেন।

শিলচরে এয়ারপোর্টের এক অফিসারের খুব আগ্রহ ছিল দীক্ষা নেওয়ার। কিন্তু যথা সময়ে তিনি এসে পৌঁছাতে পারেন নি। মহারাজ তাঁর আগ্রহ দেখে তাকে নিজের ঘরে ডেকে মন্ত্রদীক্ষা দেন।

ত্রিপুরায় ২০০১ সালে সহ-সংঘাধ্যক্ষ হিসেবে দীক্ষা দিতে গেছেন। আগরতলার এক দীক্ষাপ্রার্থী ভক্ত শ্রী মাখন চক্রবর্তী ক্যান্সারে আক্রান্ত। মহারাজ প্রথমে বললেন তাকে আলাদা করে দীক্ষা দেবেন। পরে বলেন যে যেদিন অবসর হবে, সেদিন ওকে একা দীক্ষা দেবেন। তার পরে একদিন খুব সকালে বলেন, 'ওকে খবর দাও, ওর বাড়ি গিয়ে ওকে দীক্ষা দেবো।' টিনের এক চালা যুক্ত ঘরের মেঝেতে বসে খুব দরদ দিয়ে মহারাজ ভক্তটিকে দীক্ষা দিয়েছেন। পরে যতবার ঐ অঞ্চলের শাখাকেন্দ্রের সম্পাদক বেলুড় মঠে এসেছেন, ততবার তিনি তার কাছে এই ভক্তটির সম্বন্ধে খবর নিয়েছেন।

আদিবাসী যুবক-যুবতীদের দীক্ষাদানের ব্যাপারে পূজনীয় মহারাজের খুব আগ্রহ ছিল। রাঁচি মোরাবাদি আশ্রমে, বোম্বে সাকোয়ার প্রকল্পের যুবক-যুবতীদের, নারায়ণপুরে, গৌহাটি, শিলং, চেরাপুঞ্জি প্রভৃতি স্থানে তাঁর অনেক আদিবাসী দীক্ষিত ভক্ত শিষ্য রয়েছে। একবার শিলং আশ্রমের একটি চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র পূজনীয় মহারাজের কাছে খুব আব্দার করতে থাকে মন্ত্রদীক্ষা পাওয়ার জন্যে। মহারাজ তার ব্যাকুলতা দেখে শেষ পর্যন্ত রাজী হন এবং তাকে দীক্ষা দেন।

প্রথম প্রথম তিনি ৩০ জন করে দীক্ষা দিতে শুরু করেন। পরে অবশ্য সংখ্যা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাধারণত স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে দীক্ষা দিতেই পছন্দ করতেন। বর্তমানে তাঁর দীক্ষিত সন্তানের সংখ্যা ৬৭ হাজারের কিছু বেশী। তাঁর দীক্ষিত সন্তানের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বা সারদা মঠে যোগ দিয়েছে। দীক্ষার আসনে যখন তিনি বসতেন, তখন তাঁর যেন একেবারে অন্য মূর্তি। বাইরের জগত যেন নেই তাঁর কাছে। সত্যই মনে হত, গুরুশক্তির এক অপূর্ব বিকাশ তাঁর মধ্যে দিয়ে তখন বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে।

ভক্তদের বারবার বলতেন, 'ঠাকুরকে এক হাতে ধরবে আর এক হাতে সংসারের কাজ করবে।' আবার কখনো বলতেন, 'ঠাকুরকে দুই হাত দিয়েই ধরে থাকবে।' খুব জোর দিতেন জপের উপরে। সেখানে কোন গাফিলতি মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। তাই বারবার বলতেন, 'দুবেলা জপ করতেই হবে, নাহলে অপরাধ হবে।' ভক্তদের বিশেষ করে উপদেশ দিতেন, 'মঠের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবে।'

পড়াশুনার প্রতি খুব জোর দিতেন। নিজে প্রতিদিন নিয়ম করে রাতে কথামৃত পড়তেন, আর সকালে গীতাপাঠ করতেন। যত বই আসত তাঁর কাছে, যতদিন চোখ ভাল ছিল, নিজে পড়তেন। চোখে দেখার সমস্যা শুরু হওয়ার পরে সেবকদের তা পড়ে শোনাতে হত। আগত সাধু ও ভক্তদেরও বারবার বলতেন গীতা ও কথামৃত পড়ার জন্যে।

নিজের জীবনে কখনো কর্ম থেকে ছুটি নেন নি। যদিও নিজে একান্তে সাধন-ভজন তপস্যা করেছেন। কিষেনপুরে থাকার সময় প্রতিদিন প্রচুর জপ করতেন। কালিম্পং-এও যখন ছিলেন একান্তে, তখনও জপ ধ্যান করেছেন প্রচুর। আর তীর্থদর্শন করেছেন। তীর্থমাহাত্ম্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতেন। সাধুদেরও সেকথা বলতেন। ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করতেন না। বলতেন, তীর্থদর্শন করতে যেতে।

একবার একটি আশ্রমে গেছেন। সকালে অরক্ষিত মন্দিরে গিয়ে দেখেন একটি বাঁদর মন্দির ও বিগ্রহকে অপবিত্র করছে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমাধ্যক্ষকে ডেকে মন্দিরটিকে সংস্কার করতে বললেন, বিগ্রহের অভিষেক করার নির্দেশ দিলেন। তাঁরই উদ্যোগে বহু শাখাকেন্দ্রের মন্দিরে পার্ষদদের ছবি বসানো হয়।

নিজে তীর্থবিধি মানবার চেষ্টা করতেন সাধ্যমত। কাশী, কনখল, এলাহাবাদে গঙ্গাস্নান করতে ভালোবাসতেন। একবার কুম্ভের পর গেছেন হরিদ্বারে। সেখানকার জল সামান্য পান করে মিষ্ট স্বাদ

লেগেছে। বলছেন উপস্থিত সকলকে, 'দেখো কুম্ভের পর যদি দেখো জলের স্বাদ মিষ্টি হয়েছে, তবে জেনো যে সেখানে কোন উচ্চকোটির মহাত্মা স্নান করে গেছেন।'

দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শনে যখন যেতেন অনেক ফলমূলাদি নিয়ে যেতেন। মাকে দর্শনের সময় তাঁর সেই ভক্তিব্যাকুল মুখখানি ছিল দেখার মত। মনে হত, যেন মায়ের সামনে এক পরম নির্ভরতায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

ত্রিপুরায় একবার গেছেন। সেখানে রাজবাড়ির একটি দেবী মন্দির আছে। সেটি সাধারণ্যে তত পরিচিত নয়। মহারাজ অনেকদিন আগে থেকে সেই মন্দিরের সংবাদ জানতেন। কিন্তু অনেকেই এটির সংবাদ জানতো না। মহারাজ একদিন খোঁজ নিতে বললেন যে, মন্দিরটি এখনো ঠিক আছে কিনা। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সেটি আছে। মহারাজ বললেন, 'দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে, দেবী আমায় বলেছেন।' তাঁর নির্দেশে সেই পূজা সম্পন্ন করা হয়েছিল।

তাঁর মন্দিরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর বা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করার দৃশ্যটি ভক্তহৃদয়মধ্যে চিরকাল সোনার ফ্রেমে বাঁধা হয়ে থাকবে। শাস্ত্রকাররা বলেছেন, তাঁকে জানলে সিদ্ধ ভক্ত 'মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি'। পূজনীয় মহারাজের সেই মূর্তি এই শাস্ত্রবাক্যের ধ্রুব ও জীবন্ত প্রমাণ। দীর্ঘক্ষণ মন্দিরে ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন করজোরে – একদৃষ্টে তাকিয়ে। সেবক হয়ত ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু মহারাজ সরবেন না। একবার বাঁপাশে যান তো একবার ডান পাশে। যেন মনে হত, অনেক কথা হচ্ছে তাঁর ঠাকুরের সঙ্গে, সেসব শেষ না করে কি যাওয়া যায় ! দুর্গাপূজায় যখন পুষ্পাঞ্জলি দিতেন, সে দৃশ্য দ্রষ্টা ভক্তদের মনে গাঁথা হয়ে আছে। ঐ দৃশ্যের পুনঃ কল্পনাতেই মনে ভগব্দভক্তি জেগে ওঠে। একবার মন্ত্র বললে চলবে না। তিনবার বলতেই হবে। তারপর শিউলি ফুলের অঞ্জলি। তারপর কৃতাঞ্জলি প্রণাম। মাতৃবন্দনায় মাতৃসাধকের এহেন আত্মমগ্নতায় মাতৃচৈতন্যের জাগরণ যে নিশ্চিত। পূজামণ্ডপ তাঁর সেই আবির্ভাব ও আত্মনিবেদিত অর্চনায় আধ্যাত্মিক ভাবে দীপ্ত হয়ে উঠত।

কোন জায়গায় গেলে সবসময় খোঁজ নেবেন যে সব জিনিস ওঠানো হয়েছে কিনা, ব্যাগ নেওয়া হয়েছে কিনা। এই 'সব জিনিস' আর 'ব্যাগ' কথাগুলির আলাদা মানে ছিল। আসলে তাঁর কাছে একটি ব্যাগ থাকত। সেখানে থাকত তাঁর জপমালা। সেটিই ঐ 'সব জিনিস' আর তার ব্যাগটিই হল মহারাজের সন্ধান-করা 'ব্যাগ'। বাইরের সেন্টারে যখন যেতেন জপমালাটি সবসময় থাকত বালিশের নীচে। । যখনই সেই ঘর থেকে বেরোবেন, তাতে চাবি দিয়ে বেরোতে হবে। সহ-সংঘাধ্যাক্ষ হওয়ার পরেও দীর্ঘকাল বেলুড় মঠে মন্দিরে মঙ্গলারতি ও সন্ধ্যারতিতে আসতেন, সোজা হয়ে আসন করে বসতেন

সবার মধ্যে। মগ্ন হয়ে যেতেন প্রার্থনায়, জপ-ধ্যানে। সেই মূর্তিখানি অনেকের কাছে প্রেরণার স্থল হয়ে আছে আজো। অন্য সেণ্টারে গেলেও এর অন্যথা হতো না। জেনে নিতেন সেই আশ্রমের সমস্ত সময়গুলি। একবার নারায়ণপুর আশ্রমে গিয়েছেন। সকালে জপ করতে বসেছেন। কিছুক্ষণ পরেই বেরোবার কথা আছে। কিন্তু ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সময়টি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছেন না, কিন্তু জপ করে চলেছেন মগ্নভাবে। ভাবছেন বেরোবার নিশ্চয়ই দেরী আছে। পরে সেবক অনেকবার ডাকডাকি করে তবে জপ থেকে তোলে। একটা খুব সুন্দর রুটিন-নির্দিষ্ট জীবন যাপন করে এসেছেন চিরকাল। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও রাত দুটো আড়াইটে নাগাদ উঠে জপধ্যান শুরু করে দিতেন। ভোরবেলা পর্যন্ত জপধ্যান করে বেরোতেন মন্দির প্রণামের উদ্দেশ্যে।

একবার সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে ফিরেছেন। ডাক্তার বারবার নিষেধ করেছে কিছুদিন মন্দির প্রণামাদিতে না যেতে। একদিন সন্ধ্যাবেলা সেবককে বলছেন, 'হ্যাঁরে আমাকে একটু মন্দির দর্শনে নিয়ে যাবি, আমি ভিতরে ঢুকব না, নীচ থেকে দর্শন করেই চলে আসব।' সেবক বারবার ডাক্তারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু মহারাজও নারাজ। এদিকে সেবকও নাছোড়। শেষে মহারাজের স্বগতোক্তি, 'ধুর, তাহলে কেন এলাম সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে, ওখানে থেকে মরে গেলেই ভালো হতো।'

একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম থেকে আড়াইটার আগে মহারাজ উঠে পড়েছেন। সেবকও উঠে পড়েছে। মহারাজ বলে উঠলেন, 'মহারাজ চলে গেলেন।' সেবক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, ' কী ব্যাপার মহারাজ ? কে এসেছিলেন মহারাজ ?' মহারাজের আত্মমগ্ন উত্তর, 'রাজা মহারাজ এসেছিলেন যে, আমি ফুল দেব ভেবেছিলাম !' সেবাপ্রতিষ্ঠানেও একবার শুয়ে রয়েছেন। হঠাৎ নিজেই চশমা পরে নিলেন। একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। সেবক ডাকছেন। একাধিকবার ডাকেও সাড়া নেই। তারপর বললেন, 'এই তো আমি দেখছি, তুই দেখতে পাচ্ছিস না ? এই তো দেখ্ সোজা !' অল্প একটু পরে আস্তে আস্তে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

এর আগে সহ সংঘাধ্যক্ষ হওয়ার পরে একটি চোখে অপারেশান হয়। ২০০৮ সালে আর একটি চোখে অপারেশান করা হয়। ২০০৯ সালে পেসমেকার বসেছিল। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে দুটি হার্নিয়া অপারেশানও হয়। এগুলির পরেও মহারাজ সুস্থই ছিলেন। ধীরে ধীরে মহারাজের শরীর কিন্তু খারাপের দিকে এগোচ্ছিল। সেবকেরাও তা বুঝতে পারছিলেন। ২০১৩ সালের একটা সময়ে দীক্ষা বন্ধ হয়। ২০১৪ সাল থেকেই দেখা গেল খাওয়ায় অনীহা। ২০১৫-তে ঠাকুরের তিথিপূজার রাতে সন্ন্যাসব্রত অনুষ্ঠানে যথারীতি অংশ নিলেন। কিন্তু তারপরেই দেখা গেল প্রস্রাবে রক্ত আসছে। ঠাকুরের তিথিপূজার পরের দিনেই তাই তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল সেবাপ্রতিষ্ঠানে। কিন্তু মহারাজের

হার্টের অবস্থা এবং রক্তের অন্যান্য বিষয়গুলি খুব সুন্দর নিয়ন্ত্রিতই ছিল। চিকিৎসকরাও অবাক হয়ে যেতেন যে এই বয়সেও এই বিষয়গুলি এতটা ভাল কেমন করে থাকতে পারে। ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে বেলুড় মঠে এসে সন্ন্যাসব্রত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাস দিয়েছেন এবং যথারীতি সব কাজ সমাধাও হয়েছে। ইতিমধ্যে কিডনিতে মাঝে মাঝেই স্টেণ্ট বসাতে হতো। প্রথমে একবছর পর পালটানো হয়েছিল। পরে তা ৬ মাস অন্তর পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। এই বছর ১৪ জুন তারিখে আবার একবার স্টেন্ট পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় মেডিক্যাল বোর্ড। মাইক্রোবায়োলজিস্ট, আনাস্থেসিস্ট, ইউরোলজিস্ট এবং মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে গড়া মেডিক্যাল বোর্ড সেই সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলি ঠিক করে নেয়। ৭ দিন আগে থেকেই একটি বিশেষ আণ্টিবায়োটিক দিয়ে রক্তে সংক্রমণের রোধের জন্যে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঠিক হয় এবারে সারা শরীর আনাস্থেসিয়া করা হবে। ১৪ জুন স্টেন্ট পালটানো হয় এবং সমস্ত কিছু সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ১৫ জুন তারিখে জ্বর আসে, দেখা গেল রক্তচাপ নেমে গেছে, কাশি হতে থাকে, দেখা যায় কফ উঠে আসছে। ১৬ জুন প্রস্রাবের পরিমাণ খুব কমে যায়, বুকে সংক্রমণ ধরা পড়ে। জ্বর উঠে যায় ১০২/১০৩ ডিগ্রি। রক্তচাপ হঠাৎ খুব বেশী উঠে যায়। ১৭ তারিখ মেডিক্যাল বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় যে, রাত ১০টা নাগাদ থেকে টানা ৬ ঘণ্টার ডায়ালিসিস করতে হবে। সেই জন্যে যাবতীয় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এদিকে হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। রাতের বেলা ডায়ালিসিস সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল না রক্তচাপের গোলমালের কারণে। চার ঘন্টা পরে আবার পূজনীয় মহারাজকে বেডে নিয়ে আসা হয়। ১৮ তারিখ বেলা চারটায় আবার ডায়ালিসিস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে হয় ১০৬/১০৭ ডিগ্রি। ডাক্তাররা যখন সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন আবার ডায়ালিসিসের তখনই হঠাৎ করে এক 'Massive cardiac Arrest' হয় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে। ডাক্তারদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে পূজনীয় মহারাজ যাত্রা করেন স্বধামে – 'স্বে মহিম্নি'।

সে খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সাধু-ব্রহ্মচারী ভক্ত সকলের মধ্যে। সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভিড় জমতে থাকে সেই রাত থেকেই। মঠ-মিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় ভক্তদের দর্শনের জন্যে মহারাজের পুণ্য শরীর রাখা থাকবে বেলুড় মঠে কালচারাল হলে। দাহকার্য সম্পন্ন করা হবে সোমবার ১৯ তারিখ রাত ৯টা ৩০ মিনিটে। বিদেশ সফর আছে বলে আগেই মহারাজকে দর্শন করে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহারাজের প্রয়াণে তিনি শোক জানিয়ে বলেন যে এ তাঁর স্বজন হারানোর বেদনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শোক প্রকাশ করে বলেন যে এ তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি। রাত ৯টা নাগাদ মহারাজের পুণ্য দেহ সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে আসা হয় বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে। সেই থেকেই শুরু হয় মহারাজকে দর্শনের লাইন। সারা রাত পুষ্প-উপহার নিয়ে জীবনের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশদাতা এই

মহাত্মাকে শেষ দেখার জন্যে অগুনতি মানুষ এসে পৌঁছান। সেই মানুষের সেই ভিড় ছিল পরের দিন এবং রাত পর্যন্ত। পরের দিন পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পূজ্যপাদ মহারাজের চিন্ময় শরীর কাঁধে নিয়ে সাধু-ব্রহ্মচারীরা কালচারাল হল থেকে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বের হন। পূত দেহ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের সামনে কিছুক্ষণ রাখা হয়। তারপর নিয়ে আসা হয় বেলুড় মঠের পুরানো মন্দির প্রাঙ্গণে। সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সাধুদের 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' ধ্বনি' আর ভক্তজনের 'নমো শ্রী গুরবে' গীতাঞ্জলি সহ ধীরে ধীরে সে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে রাজা মহারাজের মন্দির হয়ে মায়ের ঘাটের দিকে। সেখানে আনুষ্ঠানিক প্রথানুগত ক্রিয়াদির পরে স্বামীজীর মন্দির হয়ে তা এসে থামে পূজ্যপাদ মহারাজের নিজের বাসভবনের মূল ফটকের সামনে। প্রশাসনের ইচ্ছা অনুযায়ী গান স্যালুট দেওয়া হয়। তারপর বহমানা জাহ্নবীর তীরে সজ্জিত অন্তিম শয্যায় শায়িত হন এই সাধকপ্রবর। পবিত্র অগ্নিশিখা নিয়ে পবিত্র সে সাধকদেহ প্রদক্ষিণ করে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আকাশ তখন ঝিরঝিরে ধারায় শান্ত-মুখর, সুরধুনী তখন বারেবারে তার তরঙ্গে ছুঁয়ে যাচ্ছে ঘাটের সিঁড়িগুলি। সমবেত সন্ন্যাসীকুল গেয়ে উঠলেন, 'ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম।' রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহের বৈদান্তিক পতাকা তো কখনো শোকার্তিতে অর্ধনমিত হয় না !

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।' তাই মৃত্যুতে কোন শোক করা চলে না, অন্তত সাধনজীবনে। কিন্তু সব জীবনের সমাপ্তি তো আমাদের সংসারে একইরকম অর্থ বহন করে না। কোন কোন জীবন আসে এক দূর অনাগত কালের জন্যে অনেক সম্পদ নিয়ে। উত্তরসাধকদের জন্যে বিতরণ করে যায় সে ধন থরে-বিথরে। ভাবী কাল তার থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারে তার বেঁচে থাকার, এগিয়ে চলার, জীবন সফল করার নানা উপচার। পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দজীর জীবন এমনই এক অলোকসামান্য জীবন। যাঁরা তাঁর সাথে কাজ করেছেন তাঁরা তাঁকে নিজের আপন বলে মনে করেছেন চিরকাল। যাঁরা তাঁর দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছেন দূরে-কাছে থেকে তাঁরা সেই নানা শিক্ষণের পাঠগুলি যত্ন করে রেখে দেবেন জীবনান্ত পর্যন্ত। যাঁদের তিনি ভগবৎমন্ত্র দানে কৃতার্থ করেছেন, সেই অগণিত ভক্তকুল তাঁদের দিন-রাতের সাধনায় তাঁকে অনুভব করবে ইষ্টের সাথে ঐকাত্ম্যবোধে। তাঁর জীবন অনুসরণ করেছে সেই অনুভবযোগ্য সাধনপরম্পরা যা তিনি স্বয়ং পেয়েছিলেন তাঁর গুরু মহারাজের কাছ থেকে, দেখেছিলেন তাঁর ছোটবেলার প্রবীণ মহাত্মাদের জীবনে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হল নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসের একটি অধ্যায় – শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী পার্ষদদের দীক্ষিত সন্তান হিসেবে তিনিই শেষ এই সঙ্ঘের প্রধান হয়েছিলেন। আবার তাঁর জীবনের মধ্য দিয়েই পরবর্তী প্রজন্মের সামনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে সেই সাধনার ধারার মণিদীপ্তি। কে ভুলবে পূজনীয় মহারাজের সেই কঠোরে-কোমলে গড়া রাজকীয় ব্যক্তিত্বের স্বর্ণদ্যুতিকে ! কে ভুলতে

পারবে তাঁর সেই অনুপম আত্মনিবেদিত প্রার্থনার মূর্তিটি ! কে ভুলতে পারবে সঙ্গীত-ভজনের সময় নিবিষ্ট মুদ্রিত-আঁখি আত্মমগ্ন সাধকের স্মিত-উজ্বল মুখখানি ! খুব ভালোবাসতেন গান আর স্তোত্র। কালিকীর্তন খুব পছন্দের ছিল তাঁর। অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবের সমঝদার ছিলেন তিনি। মায়ের কোলে চিরকাল নিশ্চিন্তে থাকা সন্তান কত আনন্দেই না গাইতেন মৃদু নিঃশব্দ তালি দিয়ে, 'মা আছেন আর আমি আছি'। মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে মাঝেই মাঝেই গেয়ে উঠতেন, 'করুণাপাথার জননী আমার'। তাঁর কাছে এ তো শুধু গান নয় – এক প্রশান্ত প্রসন্ন অনুভব। সেবকেরা মাঝে মাঝেই শুনতে পেত, মন্দির দর্শন করে বাইরে যাওয়ার সময় গাইছেন দরাজ গলায় আর রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গাইছেন মৃদু গলায় -

'প্রভু আমার প্রিয় আমার
পরম ধন হে।'
'আর যাই করো প্রভু
মোরে ছাড়িবে না কভু
এই মোর ভরসা - '
'সুখে রাখো, দুখে রাখো যে বিধান হয়।'*

এ প্রার্থনা কি কেবল তিনি নিজের জন্যে করেছেন ? মনে হয় না। তাঁর মতন জগৎকল্যাণে নিবেদিত আধিকারিক পুরুষ তো কখনো নিজের জন্যে কিছু করেন না। মনে হয় তাই, এই প্রার্থনার ঐতিহ্য তিনি দিয়ে গেলেন তাঁর উত্তরপ্রজন্মের কাছে – যাঁরা তাঁর অনন্য আধ্যাত্মিক জীবনসাধনাকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করার প্রযত্নে ব্রতী হবে। বয়ে চলবে পতিতপাবনী গঙ্গা – এগিয়ে চলবে রামকৃষ্ণ ভাবশক্তির পাবনপ্রবাহখানি – আরো কত অনাগত কালের মুখরিত যাত্রাধ্বনি মিশে যাবে তাতে, ধন্য হবে তারা, শান্তি পাবে তারা এই ভাবপ্রবাহের পাবন-ছোঁয়ায়। তারপর যখন ফিরে দেখবে এই ভাবপ্রবাহের ইতিহাস – দেখতে পাবে সেখানে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজীর মত বরেণ্য অনুভবসিদ্ধ সাধকজীবন দাঁড়িয়ে আছে মহাকালের বন্ধুর পথে প্রেরণার আলোকতীর্থ হয়ে।

---

* পূজ্যপাদ মহারাজজী যেমন করে দুটি আলাদা গানের পংক্তিগুলি মিশিয়ে নিজের ভাবে গাইতেন, আমরা সেইভাবেই তুলে দিলাম। 'প্রভু আমার' গানটি রবীন্দ্রনাথের রচিত। 'আর যাই করো প্রভু' গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা। এই গানটির 'সুখে রাখো' ইত্যাদি পংক্তিটি পূজনীয় মহারাজ শেষেই বলতেন।